প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০০১২

সেদিন পূর্ণিমা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই মা আমায় নাইয়ে দিলেন, পরার জন্যে দিলেন একটা আনকোরা সাদা ধুতি। কাঁধে একটা চাদর চাপিয়ে দিলেন। তারপর বাংলোর বারান্দাটা নিজের হাতে ধুয়ে-মুছে ঝকৃঝকে করে তুললেন। সেখানে আমার বসার জন্যে একটা ছোট গালচে পেতে দিলেন। তারপর সামনের পাহাড়তলি থেকে মুন্সিরজীকে ডাকতে গেলেন নিজেই। বাড়িতে পাঁচজন চাকর-বাকর রয়েছে, কিন্তু পূর্ণিমার সকালে আমার ব্যাপারে সবকিছু মা নিজেই করে থাকেন। কারণ আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান এবং পূর্ণিমার দিনটি আমার একান্ত নিজস্ব। সে দিন তিনি চাকর-বাকরকেই আমায় ছুঁতে দেন না।

আমি এক ঘণ্টা ধরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলাম। জপ করতে করতে দেখলাম, বারান্দা থেকে কিছু দূরে সূর্যমুখী ফুলগুলো ঘাড় উঁচু করে পুব আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আকাশে কোথাও রাতের তারার ছিটেফোঁটাও নেই। নীল আকাশটা আমাদের বাংলোর বারান্দার মতোই পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। সূর্যিঠাকুর তখনও সেখানে আসেননি। সম্ভবত তাঁর মা তাঁকে নাইয়ে দিচ্ছেন। সে জন্যেই রোজ তাঁকে অমন চক্‌চকে উজ্জ্বল দেখায়। তাঁর মা নিশ্চয়ই আমার মা-র মতো নিষ্ঠুর, রোজ তাঁকে জোর করে নাইয়ে দেন। অবশ্য কখনো কখনো নাইতে আমার ভালোই লাগে। বিশেষ করে পাহাড়তলিতে ঝিরুঝির করে বয়ে যাওয়া নদীটিতে, যেখানে পানচাক্কির জল ঝর্ণার স্রোতের মতো নদীতে এসে মিশেছে। নীল জলে অসংখ্য বুদ্‌বুদ তৈরি হয়, আমার গায়ে কাতুকুতু দিয়ে যায়, ঠিক যেমন আমার খেলার সাথী তারা কাতুকুতু দেয় আমায়।

আপনারা তারাকে চেনেন না, তাই না। তারা হলো মোলু মুচির মেয়ে। আমাদের বাংলোর নীচে পাহাড়তলিতে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকে ওরা। বড় গরিব। ওর ফ্রকটার এখানে ওখানে ছেঁড়া, সালোয়ারটারও এখানে ওখানে তালি লাগানো। ওর মা কখনও ওর চুলে তেল দিয়ে দেয় না। ওরা মাথায় তেল না মেখে বরং সেটা খাবারের জন্যে ব্যবহার করে। মা ওদের খুব ঘেন্না করেন।

কারণ ওরা গরিব, নীচু জাত। তারার মা-বাপকে অবশ্য আমারও পছন্দ নয়। রোগাপট্‌কা চেহারা, ময়লা রঙ, সব সময় যেন না-খেয়ে রয়েছে। মা ওদের মোটেই পছন্দ করেন না, অথচ রোজই ওরা মা-র কাছে কিছু না কিছু চাইতে আসে। কারণ মোল্ মুচির জমি-জায়গা নেই, কেবল জুতো তৈরি করে।

কিন্তু তারাকে আমার পছন্দ। মুখটা গোল, ঠিক চাঁদের মতো। ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট দু'খানি ফাঁক করে যখন হাসে, তখন আমার ভীষণ ভালো লাগে। ভেবে রেখেছি, বড় হয়ে আমি তারাকে বিয়ে করব। কিন্তু বড় হতে এখনো অনেক দেরী। কারণ আমার বয়েস আট বছর, তারার মোটে ছয়। মা ও বাপীর মতো হতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। জানিনে, বড়রা আমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের কেন যে বিয়ে করতে দেয় না! আমার মা তারার সঙ্গে আমায় খেলতেও দেন না! লুকিয়ে-চুরিয়ে খেলি আমরা। তারা খেলতে খেলতে যখন আমার ওপর রেগে যায়, তখন সে আমায় বিয়ে করতে চায় না। আসলে ওর দুটো বিয়ে করার ইচ্ছে। কয়েক মাস আগে রাজাসাহেবের মাহুত হাতীর পিঠে চড়ে আমাদের বাংলোর সামনে দিয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে সে ঠিক করেছে, আগে সে ওই মাহুতটাকে বিয়ে করবে, তারপর আমায়। তখন থেকে আমিও বলে আসছি, 'তুই দুটো বিয়ে করতে পারবিনে।' ও আমায় মুখ ভেংচিয়ে বলে, 'কেন পারব না? মুন্সির গঙ্গারাম যদি দুটো বিয়ে করতে পারে, তবে আমার বেলা হবে না কেন?' এ প্রশ্নের জবাব ছিল না আমার কাছে। যখন তারার কোনো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনে, তখন পিটুনি লাগাই ওকে। দুটো বিয়ে করার কথা বললেও পিটুনি লাগাই।

'আরে, আমি যে তোমায় পাঁচশো বার গায়ত্রী মন্ত্র পড়তে বলে গেলাম! কি ছেলে গো! গালচেতে চুপচাপ বসে সূর্যমুখী ফুলের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে! দেখছটা কি শুনি?'

মা-র সাড়া পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি জোরে জোরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। মা রাগটা চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতে মুন্সিরজীকে বললেন, 'আশ্চর্য ছেলে বাবা! সব সময় কি ধ্যানে যে থাকে, বুঝিনে!'

মুন্সির গঙ্গারাম বললেন, 'সে জন্যেই আমার শেখানো মন্ত্রগুলোতে কিছু কাজ হচ্ছে না। আসলে মন্ত্রগুলো পড়েই না……।'

মা আমায় মারার জন্যে হাত তুললেন, অমনি মুন্সিরজী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'না না, এই শুভ মুহূর্তে ছেলেকে মারা ঠিক হবে না।'

মা বকতে বকতে পেছনে সরে গেলেন। মুন্সিরজী জিজ্ঞেস করলেন, 'সপ্ত শস্য তৈরি তো?'

পূর্ণিমার দিন আমায় সাত রকমের শস্য দিয়ে ওজন করা হয়। আমার ওজন যতটা, ঠিক ততটা সাত রকমের শস্য আনা হয়। মাসকলাই, ছোলা, চাল, গম,

তিল, তুষ্টা, জোয়ার —এই নিয়ে সপ্ত শস্য। বারান্দা থেকে কিছুটা দূরে বাগানে আমলকী গাছে কাঠ ওজন করা বড় দাঁড়িপাল্লা টাঙানো রয়েছে। তার একদিকে আমায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিকে সপ্ত শস্য চাপানো হয়। দু'টো পাল্লা একেবারে সমান হলে পাল্লা থেকে আমায় নামিয়ে নেওয়া হয়, আর সমস্ত শস্য মুন্সিরজীকে দিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ ওজনের কাজটি চলে, ততক্ষণ মুন্সিরজী কি যেন মন্ত্র পাঠ করেন। গত আট বছর ধরে এই চলে আসছে। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান বলেই এটা করা হয়। মোটে আট বছর বয়েস, তার ওপর ভীষণ রোগা। মা আমায় বেশী বেশী করে খাওয়ান। কিন্তু বাপীর ধারণা, মা আমায় বেশী করে খাওয়ান বলেই আমি দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছি। যদি মা আমার স্বাস্থ্যের দিকে একটু কম নজর দিতেন, আমার খেয়াল-খুশির ওপর ছেড়ে দিতেন খানিকটা, তাহলে খুব শিগগির আমি না-কি মোটা তাগড়া হয়ে উঠতাম। কিন্তু মা সে কথা শুনলেই রেগে যান। বাপীকে বলেন, 'তুমি খুব নিষ্ঠুর। নিজের ছেলের ওপরেও তোমার টান নেই একটু।'

বাপীকে আমার খুব পছন্দ। তিনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে খেলেন। কিন্তু মা আমার সঙ্গে কখনও খেলেন না। সব সময় বকাঝকা করেন আর খাওয়ান। আপনারা ভাবতে পারবেন না, খাওয়ার ওপর আমার কেমন ঘেন্না ধরে গেছে! যে সব ছেলেরা দিনে মাত্র একবার খেতে পায়, জলখাবার কখনও জোটেই না, ফল বলতে শুধু সেটুকুই যা আমি আমাদের বাগান থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে দিই, যারা আজ পর্যন্ত একটা ডিমও খায়নি, আমার সেই সব ছেলেদের মতো হতে ইচ্ছে করে। আমায় রোজ এ সব খেতে হয়। তা সত্ত্বেও অন্য ছেলেপিলেরা আমার চেয়ে বেশী মোটা-সোটা। আমি খুব দুর্বল। ওদের চেয়ে বেশী দৌড়তে পারি। কিন্তু কুস্তি-লড়াই, ঘুষোঘুষি, পাঞ্জা কষাকষিতে ওদের গায়ের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশী।

যখন মুন্সিরজী কাঠ ওজন করা দাঁড়িপাল্লায় আমায় ওজন করে সপ্ত শস্য বেঁধে-ছেঁদে ফেললেন, তখন মা আমায় অন্য জামা-কাপড় দিলেন। গাঢ় নীল রঙের হাফপ্যান্ট আর আকাশী নীল রঙের জামা। হাফপ্যান্ট মখমল কাপড়ের তৈরি, জামাটা নীল আকাশের মেঘের মতোই মনোমুগ্ধকর। মা মুন্সিরজীকে আমার নতুন ধুতিটা দিয়ে দিলেন, কালকেই সেটা বাজার থেকে কিনে আনিয়েছিলেন। মুন্সিরজী সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমায় আশীর্বাদ করে বাড়ি রওনা হয়ে গেলেন। বারান্দা থেকে দূরে জঙ্গলটা পেরিয়ে যখন তিনি পাহাড়ী পথ ধরলেন, তখন বাপী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুন্সিরজীর ফেরেব্‌বাজি শেষ হলো?'

মা ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'হ্যাঁ হলো।'

'এ বার তো গুরুদ্বারে যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব। —যাবই তো। আর না গিয়ে কি উপায় আছে? নিজের ছেলের

জন্যে তোমার তো একটুও ভাবনা-চিন্তা নেই। কি যে অসুখ ধরেছে, বাছা আমার দিন দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে! চোখ তুলে দেখেছ কখনও?'

বাপী আমায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন। চোখ টিপলেন আমায়। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'হা ভগবান তোমার ছেলের কিছুই তো হয়নি। ও আমাদের একমাত্র সন্তান, এটাই অসুখ ওর। আমার মনে হয়, এ বার আমাদের আর একটা বাচ্চার দরকার হয়ে পড়েছে...... ।'

'ইস্ মাগো, কি সব কথা বলছ তুমি! এইটুকু ছেলের সামনে কথাটা মুখে আনতে একটু লজ্জা করল না তোমার?' রাগ, খুশি, ভয় ও লজ্জা-জড়ানো গলায় মা বললেন।

মা সনাতন ধর্মের ভক্ত। বাপী আর্যসমাজী। এ নিয়ে প্রায়ই দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এই বিতর্কে কখনো কখনো আমাকেও টেনে আনা হয়। বাপী অবশ্যই মিষ্টি আদর করে জিজ্ঞেস করবেন আমায়, আর মা যা-কিছু জিজ্ঞেস করবেন, সবটাই চড়া মেজাজে।

বাপী জিজ্ঞেস করেন, 'আমার সোনা আর্যসমাজী, তাই না?'

আমি তাঁর কোলে উঠে বসে বলি, 'হ্যাঁ, আমি আর্যসমাজী।'

আবার মা-ও কখনো কখনো আদর করেন আমায়। কোলে তুলে নিয়ে আমার মুখে চুমু খান। তারপর বাপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় বলেন, 'না, আমার ছেলে সনাতনী। তাই না লক্ষ্মী সোনা?'

আমি মা-র কাঁধে দুটো হাত রেখে আদুরে গলায় বলি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সনাতনী। আমি আমার মা-র সনাতনী ছেলে।'

এমন সুযোগ পেয়ে মা জিভ বার করে বাপীকে ভেংচি কাটেন। তারপর দু'জনেই জোরে হেসে ওঠেন। এ খেলায় ভারি মজা পাই আমি।

• • •

গুরুকুলে যাওয়ার দুটি রাস্তা। একটা বাজারের ভেতর দিয়ে গেছে। অন্যটা আমাদের বাংলোর পেছনের বাগান দিয়ে। আমরা দু'জন বাগানের পথটা ধরলাম। আগস্টের চমৎকার দিন। বাগানের আপেলগুলো লাল হয়ে এসেছে। আর নাশপাতিগুলো তারার মুখের মতো সোনালী হয়ে উঠেছে। ফলগুলোর গা এমন মসৃণ ঝকঝকে, যেন চুনারের পাতায় আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। সেপ্টেম্বর মাসে চুনারের পাতাগুলো আগুনের ফুলকির মতো রাঙা হয়ে উঠবে, ঝরঝর করে ঝরে পড়বে নীচে। তখন আমি আর তারা সেই পাতাগুলো নিয়ে খেলব। আমরা সেই সোনালী পাতার মুকুট তৈরি করে একজন আর একজনকে পরাব। তিন-চারটি পাতা জুড়ে নৌকো বানিয়ে নদীর জলে ভাসাব। সোনালী পাতার নৌকো-গুলো জলে ভাসতে দেখলে রাজাসাহেবের পুকুরে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলগুলির কথা মনে পড়ে।

পূর্ণিমার সকাল সত্যিই ভারী চমৎকার! সারা দিনটিই আমার নিজের। খুব ভালো লাগে।

মা খুব সাবধানে বেশ গর্বের সঙ্গে হাঁটছেন। আমি তাঁর চারদিকে চক্কর খেতে খেতে চলেছি। কখনো ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি, আবার কখনো প্রজাপতি ধরতে গিয়ে বেশ পেছনে পড়ে যাই। কখনো এগিয়ে যাওয়ার জন্যে কখনো পিছিয়ে পড়ার জন্যে মা বকেন। সত্যিই বাচ্চাদের ভারি কষ্ট। তারা বুঝতেই পারে না বড়রা কি চায়! পিছিয়ে পড়লে বকুনি, এগিয়ে গেলেও বকুনি। আবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটলে বলেন, 'পায়ে পায়ে হাঁটছিস কেন? এগিয়ে চল।' বড়রা যে কি চায়, বোঝা মুশকিল।

পূর্ণিমার সকালে গুরুদ্বার যাওয়াটা আমার খুব পছন্দ। ওখানকার লোকেরা ঢোলক আর বাজনা বাজিয়ে গান গায়। মন্দিরে সেটা হয় না। সেখানে ধবধবে সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো একটা বই খুলে চমৎকার সুরে কি যেন পড়েন আর বারবার চামর দোলান—শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। মানে বুঝতে পারিনে, কিন্তু ভালো লাগে। তারপর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার পরে আমার চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কারণ আমি জানি, এ বার হালুয়া পাওয়া যাবে। সাদা মলমল কাপড়ে ঢাকা একটা বড় পাত্র নিয়ে একজন এগিয়ে আসে। আমি তার সামনে দু'হাত পেতে ধরি। লোকটা গরম গরম হালুয়া তুলে আমার হাত দুটো হাত ভর্তি করে দেয়। মাঝে মাঝে হালুয়া এমন গরম থাকে যে আমি হাতের হালুয়া ওপরে-নীচে করতে থাকি, কিন্তু কখনও নীচে পড়তে দিইনে। হালুয়া যেমন মিষ্টি আর নরম, তেমনি গন্ধে ম-ম করে। আমি মাকে বলি, 'আমি যখন বড় হব, তখন ঠিক গুরুদ্বারের পাঠক হব!' মা দুঃখ করে মাথা নেড়ে বলেন, 'কি করে হবি! তুই আমাদের একমাত্র ছেলে। যদি তোর একটা ভাই থাকত, আমি তোর চুল রেখে দিতাম।' তখনকার দিনে, মানে আমাদের শৈশবকালে, অধিকাংশ হিন্দু-বাড়িতে বড় ছেলের চুল রেখে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে কয়েক পা দূরে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ। তার চারপাশ শান বাঁধানো। সেখানে তুলসীর টবগুলোর মাঝে বেশ কয়েকটা ভাঙা-চোরা পাথরের মূর্তি রয়েছে। মূর্তিগুলো দেখতে ভারি চমৎকার। একটা মূর্তি তো আমার মা-র মতোই সুন্দর। আর একটা মূর্তি রয়েছে নাচের ভঙ্গিতে। চারটি হাত তার—কিন্তু একটি পা ভাঙা। আর একটি মূর্তির মাথা নেই, শুধু ধড়টা রয়েছে। একটি যুবতী মেয়ে, তার দেহের গড়ন ভারি চমৎকার। ভোরবেলা আমাদের বাংলোর সামনের পথ দিয়ে যে সব মেয়েরা মাথায় কলসি নিয়ে ঝর্ণার জল আনতে যায়, ঠিক তাদের মতো দেখতে।

অনেক মূর্তির গায়েই সিঁদুর লাগানো। কাছেই বাঁশ পুঁতে কে যেন কাঠ-কুটো আর ঘাস-পাতা দিয়ে একটা চালা বানিয়ে দিয়েছে। সেখানে একটা ঘণ্টা

ঝুলছে। মা তুলসীর পাতা ছিঁড়ে মূর্তিগুলোর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে হাত জোড় করলেন। আমাকেও হাত জোড় করতে এবং চোখ বুঁজে প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু আমি মিটমিট করে চেয়ে সুন্দর মূর্তিগুলো দেখতে লাগলাম। তারপর মা যখন চালায় গিয়ে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলেন, তখন ঘণ্টা বাজাবার জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করছিল। মাকে বললাম, 'মা, আমি এখানকার পূজারী হব। তাহলে রোজ ঘণ্টা বাজাতে পারব!'

মা হেসে বললেন, 'পাগল ছেলে কোথাকার! তুই পূজারী হতে পারবিনে।'

'কেন পারব না?'

'তুই ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ নোস। শুধু ব্রাহ্মণরাই পূজারী হতে পারে।'

ক্ষত্রিয়রা কেন যে ঘণ্টা বাজাতে পায় না, সে-কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে বললাম, 'তাহলে আমি বড় হয়ে ব্রাহ্মণ হব।'

'তুই একটা আস্ত বোকা।' মা জোরে হেসে উঠলেন, 'ক্ষত্রিয় কখনও ব্রাহ্মণ হতে পারে? ওটা অসম্ভব।'

অসম্ভব যে কেন, সেটাও আমার মাথায় ঢুকল না। যদি ছোটরা বড় হতে পারে, তাহলে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ হতে পারে না কেন?

কিন্তু মাকে কিছু জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। আমরা ছোটরা কত প্রশ্ন করি রোজ, ক'টা প্রশ্নেরই বা জবাব পাই আমরা! বড়রা তো ঠাকুর দেবতার মতো, ইচ্ছে হলে তো জবাব দিলো, ইচ্ছে না হলে রাগ করে কথাই বলল না। এই পৃথিবীতে শিশুদের ভারি কষ্ট!

অশ্বত্থ গাছতলা থেকে এগিয়ে মা আমায় একটা চওড়া রাস্তায় নিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম এ বার কোথায় যাওয়া হবে। সে জন্যে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। লোকালয় থেকে দূরে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে ধানক্ষেত ও ছোট ছোট জংলী তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলে গেছে। পথের দু'পাশে মাঝে মাঝে উঁচু-নীচু ঢিবি। দুটি কাঠের পুল। পুলের নীচে কলকল করে বিপজ্জনক নালা বয়ে চলেছে। নালার দু'পাশে অনেক গাছ। বাতাস বইলে গাছগুলো থেকে সাঁ-সাঁ শব্দ হয়—যেন দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

এই পথটা আমার খুবই ভালো লাগে। সে জন্যে মা-র নিষেধ সত্ত্বেও আমি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে চললাম। প্রথম ঢিবিটায় একটা পেয়ারা গাছের নীচে একপাল ভেড়া রয়েছে। গাছের একটা ডাল নুইয়ে তার ওপর চড়ে বসে আছে এক রাখাল ছেলে। গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে সে তার সঙ্গী মেয়েটিকে খাইয়ে দিচ্ছে। আনন্দে খিলখিল করে হাসছে দু'জনে। ওদের দেখে আমার ইচ্ছে জাগল, আজ আমি তারাকে ওই রকম করে নাশপাতি খাইয়ে দেবো।

এই ভেবে খুশি হয়ে দৌড়তে দৌড়তে সামনে এগিয়ে গেলাম। সামনে একটা

খরগোশ তার লম্বা লম্বা কান খাড়া করে দেখল আমায়, তারপর দূরের জঙ্গলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। দুটি কাঠবিড়ালী নাচতে নাচতে চিকরী গাছের সাদা গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো। ওদের ধরার জন্যে আমিও গাছে উঠে পড়লাম। কিন্তু ওরা দু'টোই আমার চেয়ে হাল্কা আর ছটফটে। আমার নাগালের বাইরে একটা সরু ডালে বসে নিজেদের বাহারে লেজ মুখে পুরে দুষ্টু দুষ্টু চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার ইচ্ছে করছিল, আহা, আমিও যদি কাঠবিড়ালী হতাম! এমনি নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে ইচ্ছেমতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম, আখরোট গাছে চড়ে কুরে কুরে আখরোট খেতাম। কিন্তু আমার তো বাপ-মা রয়েছেন, একটা বাংলো রয়েছে, সেখানে পাঁচজন চাকর রয়েছে। ওরা সবাই আমায় চোখে চোখে রাখে। মানুষের ছেলে হয়ে জন্মানো সত্যিই বড় দুঃখের।

মা এসে আমায় চিকরী গাছ থেকে নামালেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আমার দুষ্টু স্বভাবের জন্যে তিনি অনেকক্ষণ ধরে বকলেন। কিন্তু বড়দের স্বভাবই ওই রকম। একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়েন, যখন-তখন রেগে যান, কাঠবিড়ালী খরগোশ আদৌ ভালোবাসেন না। সব সময় ভুরু কুঁচকে কি যেন গভীর চিন্তা করেন। আমি রাত্রে প্রায়ই শুনি, মা বাপীকে বলছেন, 'ছেলে বড হয়ে উঠল। এ বার আমাদের কিছু টাকা-পয়সা জমানো উচিত।' আমি তো কোনো কাঠবিডালী কিম্বা খরগোশকে আজ পর্যন্ত কিছু জমাতে দেখিনি।

চিকরী গাছ থেকে নেমে আমি আবার মা-র আগে আগে হাঁটতে লাগলাম। মোড় ঘুরে আমরা হঠাৎ একটা উঁচু টিলার দিকে এগিয়ে চললাম। টিলার ওপর একটা বড কুল গাছ। কুলগাছের ডালে ডালে ময়লা ন্যাকড়ার অসংখ্য ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা রয়েছে। এটাই পীর শাহ্ মুরাদের মাজার (সমাধি)। এখানে চাচা রমজানী থাকেন। তাঁর ছেলে জব্বরা আমার খুব বন্ধু। পূর্ণিমার দিন এলেই সে আমার পথের দিকে চেয়ে থাকে। মা যখন মাজারে নজর-নিয়াজ চড়াতে থাকেন, তখন আমি আর জব্বরা কুল গাছের আশপাশে লুকোচুরি খেলি আর শুকনো পাতার মধ্যে লাল লাল কুল খুঁজে খাই। কুল গাছের সবুজ পাতার ঝোপে বসে বুলবুলি ডাকে, ময়না গান গায়, আর সাদা ঝুঁটিওয়ালা হলুদ পাখিরা শিস দেয় —কুহু কুক্ —কুহু কুক্।

পীর শাহ্ মুরাদের মাজার খুব ভালো লাগে আমার। জব্বরার সঙ্গে খেলতেও খুব ভালো লাগে। চাচা রমজানীকেও পছন্দ করি আমি। সে জন্যে আমরা যখন মাজার থেকে নীচে নেমে এলাম, তখন আমি খুশিতে ডগমগ করে মাকে বললাম, 'মা, আমি মনে মনে কি ঠিক করেছি জানো, বড় হয়ে মুসলমান হব।'

আমি তো ভাবতেই পারিনি কি এমন খারাপ কথা বলেছি। মা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আর তক্ষুনি তিনি আমার হাত দুটো ধরে ফেলে

গালে এক প্রচণ্ড চড় কষালেন। আমি 'ঔ্যা ঔ্যা' করে কাঁদতে শুরু করলাম। সারা রাস্তাটাই কাঁদতে কাঁদতে এলাম। চিকনী গাছের কাঠবিড়ালীরা আমার কাঁদতে দেখল, খরগোশ আমায় কাঁদতে দেখল, পেয়ারা খেতে খেতে রাখাল-রাখালনীও আমার কাঁদতে দেখল। মা আমায় অনেকবার চুপ করাতে চাইলেন, কিন্তু আমি গোঁ ধরে কাঁদতেই থাকলাম। সারা পৃথিবীটা দেখুক আমি কাঁদছি। মা আমায় মেরেছেন, আর আমি কেঁদেই চলেছি। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমি একটা কাঠবিড়ালী হয়ে গেছি, আর মা আমায় চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি একটা খরগোশ হয়ে লুকিয়ে পড়েছি, মা পাগলের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি কুল গাছে একটি বুলবুলি পাখি হয়ে গেছি, আর আমার মা একেবারে ভেঙে পড়ে মাজারের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছেন। মা-র সেই দুরবস্থা কল্পনা করে দুঃখে আমার মন কানায় কানায় ভরে উঠল, আমি আরও জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলাম। বাংলোয় ফিরে আসার পর বাপী আমায় আদর করলেন এবং বাগানে গিয়ে খেলার জন্যে ছুটি দিয়ে দিলেন, তবেই আমার কান্না থামল।

আমিও তাই চাইছিলাম। মুহূর্তে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেলো। বাগানের যেখানে বড় বড় লোহার খিলান দেওয়া তারের জালের ওপর আঙুরলতা ছেয়ে আছে, আর এখানে-ওখানে বোগেনভেলিয়ার লাল ফুল জলজল করছে, সেখানে ছুটে গেলাম আমি। এখানেই তারা কোথাও-না-কোথাও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি তাকে সাড়া দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজছি, এমন সময় একটা লোহার খিলানে চড়ে আঙুরলতার ঝোপে লুকিয়ে লুকিয়ে লালচে-লালচে আঙুর খেতে দেখলাম ওকে। আমি তার পা ধরে টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেললাম। তারপর ওর মুখে আঙুর গুঁজে দিলাম।

তারা বলল, 'কি হচ্ছে এ সব? সরে যাও।'

আমি একটু সরে গিয়ে বললাম, 'সেই রাখাল ছেলে ও মেয়ে দুটিতে এমনি করে একজন আরেক জনকে পেয়ারা খাওয়াচ্ছিল।'

'তাই বলে একজন আরেক জনের ঘাড়ে চেপে এমনি করে খাওয়ায় না-কি? বোকা কোথাকার!'

'আচ্ছা, আমি তোকে খাইয়ে দেবো, তুই আমায় আগে খাইয়ে দে।'

'না, আগে তুমি খাওয়াও।'

'তা হবে না, তুই আগে খাওয়াবি।'

'বেশ, ইকড়-দুকড় করে নিই।' এই বলে তারা একবার আমার বুকে একবার তার নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলতে লাগল, 'ইকড় দুকড় ভম্বা ভও, আশি নব্বে পুরা চাবা সও! —তুমি —তুমি মশাই। এ বার আমায় আঙুর খাইয়ে দাও।'

খিলান দেওয়া জালের ওপর থেকে একগোছা সবচেয়ে ভালো আঙুর পেড়ে আনলাম। তারপর তারাকে খাইয়ে দিতে দিতে ইকড়-দুকড় শুনতে লাগলাম, 'ইকড় দুকড় ভম্বা ভও, আশি নব্বে পুরা চারা সও—নে, এ বার আমার খাইয়ে দে।'

হঠাৎ তারা আমার হাত থেকে আঙুরের থোকাটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিলো। দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করছে, 'খাওয়াব না, খাওয়াব না, খাওয়াব না।'

ও আগে আগে দৌড়ায়, আমি চিৎকার করতে করতে ওর পেছনে পেছনে দৌড়াই। দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কারোরই খেয়াল ছিল না যে আমরা কোথায় এসে পড়েছি। যখন খেয়াল হলো, দেখলাম, আমরা দু'জনে আমাদের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। মা খপ করে তারাকে ধরে ফেললেন, তারপর জোরে জোরে চড়-চাপড় চালাতে চালাতে বলতে লাগলেন, 'বজ্জাত, ইতর, ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার! আজ পূর্ণিমার শুভদিনে আমার ছেলের সঙ্গে খেলছিস! তাই তো ভাবি, বাছা আমার সেরে উঠছে না কেন। সত্যিই তাই। আজ আমি তোর হাড়-গোড় ভেঙে ফেলব।'

আর সত্যিই, মা-র মাথায় এমন রাগ চেপেছিল যে, সেই সময় বাপী যদি তারাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে তিনি ওর হাড়-গোড় ভেঙেই ফেলতেন। তারা কাঁদছিল। বাপী এগিয়ে এসে তারাকে কোলে তুলে নিয়ে বাগানে চলে গেলেন। লাল লাল আপেল পেড়ে তার আঁচল ভরে দিলেন। সুন্দর আপেলগুলো দেখে তারা প্রহারের কথা ভুলে গেলো, জল ছলছল চোখে হাসতে লাগল সে। বাপী মাকে বললেন, 'খবরদার, আর কক্ষনো তুমি আমার ছেলেকে তারার সঙ্গে খেলতে নিষেধ করবে না।'

মা বললেন, 'তারা অচ্ছুত, চামারের মেয়ে।'

'চামারের মেয়ে তো কি হয়েছে? মানুষ নয়?'

'তুমি নিজের ধর্ম নিজের কাছে রাখো। আমি আমার ছেলেকে তোমার মতো নাস্তিক হতে দেবো না।' এই বলে মা আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'তাই না লক্ষ্মী সোনা? তুই আমার ছেলে তো?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ…।' কিন্তু আমার দৃষ্টি তারার আঁচলের লাল আপেলগুলোর দিকে।

'আমার কথা শুনবি তো?'

'হ্যাঁ…।' আমি আস্তে বললাম। কিন্তু তারার আঁচলের লাল আপেল-গুলোতে আমার চোখ যেন আটকে রয়েছে।

'বল দেখি, কোন ধর্মটা তোর পছন্দ? আমার, না তোর বাপীর?'

'আমার ওই আপেল পছন্দ।'

বাপী জোরে হেসে উঠলেন।

মা আমায় এক চড় মেরে রেগে বললেন, 'বল, কোন ধর্মটা তোর পছন্দ? আমার, না তোর বাপীর?'

আমি কাঁদতে কাঁদতে একটা আঙুল তুলে বললাম, 'আমার ওই আপেল পছন্দ।'

* * *

এই ঘটনার পর বহুকাল কেটে গেছে। জীবনের সেতুর নীচে দিয়ে কত জল তীব্র গতিতে বয়ে গেছে। চল্লিশ বছর ধরে আমি কোনো আপেল গাছের ডালে একটি কুঁড়িও ফুটতে দেখিনি। অবদমিত আশা, অপূর্ণ বাসনা এবং নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার অন্ধকার আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এসে জীবনের কারাগারের এই গরাদ থেকে পেছনের দিকে যখন উঁকি মারি, তখন আমার স্মৃতিপথে সেই আট বছরের শিশুটিকে মনে পড়ে, যাকে তার মা চড়ের পর চড় মেরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বল, তোর কোন ধর্মটা পছন্দ?' আর সেই শিশুটি চড় খেয়েও একগুঁয়ের মতো লাল আপেলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'আমার ওই আপেল পছন্দ। —আমার ওই আপেল পছন্দ।'

যদি আমাদের শৈশবের স্বপ্ন আমাদের পথপ্রদর্শক হতো, তাহলে এই পৃথিবী কতই না সুন্দর হয়ে উঠত।

আহা, তেমনটি হতো যদি!

দুই

মা যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে গেলেন, তখন বাপী খুব খুশী। কেন না, দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে মা বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা মুখে এনেছিলেন।

বাপী কৃপাল সিং মুশিরমালকে বলছিলেন, 'তাছাড়া এত কাল একসঙ্গে থাকলে মানুষের একঘেয়ে লেগে যায়। যখনই দেখুন, স্ত্রী-পুরুষ একজন আরেক জনের সঙ্গে জোঁকের মতো লেগে আছে। কেউ কখনও সরে যাওয়ার নামই করে না। এত দিন ঈশ্বরও যদি আমার সঙ্গে থাকত, ঘেন্না ধরে যেত আমার। মেয়েমানুষ তো মেয়েমানুষই।'

সর্দার কৃপাল সিং থতমত খেয়ে বললেন, 'এ কি কথা বলছেন আপনি? আমার গিন্নি তো একুশ বছর বাপের বাড়ি যায়নি। আমাদের জীবন তো কখনও কারোর জন্যে একঘেয়ে মনে হয় না।'

'আপনার কথা আলাদা। আপনি মুশিরমাল। মাসে বিশ দিন বাইরে কাটান। দূরে দূরে থাকেন। স্বভাবতই মাসে বিশ দিন স্ত্রীর কাছ থেকেও দূরে থাকতে হয়। বিশ দিন পরে বাড়ি ফিরলে ভালো তো লাগবেই। আর আমায় রোজই বাড়িতে কাটাতে হয়। এই দেখুন না, গিন্নি পাঁচ বছর পরে বাপের বাড়ি গেলো। সেই একই বাড়িতেই তো রয়েছি, কত ভালো লাগছে! নিজেকে কত স্বাধীন মনে হচ্ছে, কত নিশ্চিন্ত। ভাবনা-চিন্তা বলতে কিছু নেই। জানি, তিন-চার মাস পরে গিন্নির কথা ভেবে ভেবে উতলা হব। তখন সে এলে ভালোও লাগবে খুব। আমার মতে, স্ত্রীদের মাঝে মাঝে জোর করে মাস তিনেকের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার—এ জন্যে রাজাসাহেবেরও আইন জারি করা উচিত।'

সর্দার কৃপাল সিং হেসে বললেন, 'রাজাসাহেবের যদি ইচ্ছে হয়, নিজের মহলের সব রাণীকেই সারা জীবনের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন না, তারপর আবার নতুন নতুন রাণী এনে হারেম ভরে তুলুন। কিন্তু ও সব ব্যাপার রাজা বাদশাদের জন্যেই। কর্তারের মা বলছিল আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করতে। সে জন্যেই আমার আসা।'

'কিন্তু আমি তো কাল কয়মান পাহাড়তলি যাচ্ছি।'

'মাছ ধরতে?' বিস্ময়ে ও আনন্দে জিজ্ঞেস করলেন কৃপাল সিং। কণ্ঠস্বরে খানিকটা দুঃখও মেশানো যেন।

বাপী বললেন, 'হ্যাঁ। আপনিও চলুন না?'

'না ভাই। কোথাও যাই কি করে এখন? এই তো ক'দিন হলো বাড়ি ফিরলাম। তা কদ্দিন থাকবেন ওখানে?'

'সপ্তাখানেক থাকব। আর যদি মন টিঁকে যায় তো দশ দিন।'

'আচ্ছা, আমি আসি তাহলে। করমান থেকে ফিরে কিন্তু একদিন আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে হবে। নইলে আপনার বৌদি খুব রাগ করবে।'

'বৌদিকে আমার হয়ে হাত জোড় করে 'সৎ শ্রী আকাল' বলে দেবেন ভাই। ফিরে এসেই আমি নিজে গিয়ে হাজির হব।'

সর্দার কৃপাল সিং চলে যেতেই আমি আনন্দে লাফাতে লাগলাম। হাততালি দিতে দিতে বললাম, 'বাঃ বাঃ, কি মজা! আমরা করমান যাব। মাছ ধরতে যাব।'

আসলে মা-র সঙ্গে আমিও চলে যেতাম, যদি-না বাপী চুপিচুপি মাছ ধরতে যাওয়ার লোভ দেখাতেন আমাকে। শুনেছি, করমান পাহাড়গুলি না-কি খুব সুন্দর। প্রায় ছ' হাজার ফুট উঁচুতে আশমা নামে একটা ঝিল রয়েছে। দৈর্ঘ্যে ছ'মাইল, প্রস্থে দু'মাইল। সেখানে রাজাসাহেবের একটা ডাকবাংলোও রয়েছে। ভারী চমৎকার জায়গা।

'যদি তুমি থাকো, আমি তোমায় করমান নিয়ে যাব।' বাপী আমায় কথা দিয়েছিলেন। সেই লোভে আমি মা-র সঙ্গে যেতে চাইনি। জিদ ধরেছিলাম, 'আমি বাপীর কাছে থাকব।'

মা আমায় ব্যাটারিতে-চলা খেলনা মোটরগাড়ি কিনে দেবো বলেছিলেন। কিন্তু আমার কাছে তো চাবি দেওয়া মোটরগাড়ি রয়েছেই। সে জন্যে ব্যাটারিতে-চলা মোটরগাড়ির লোভ আমায় এমন কিছু কাবু করতে পারেনি যে আমি করমান বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে জলাঞ্জলি দেবো। তবে হ্যাঁ, কোনো বড় শহরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখানোর কথা যদি বলতেন, তবে না হয় ......আমি ভীষণ গম্ভীর হয়ে লাভ-লোকসান যাচাই করতে থাকি।

মা ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'তাহলে থাকো তুমি তোমার বাবার কাছে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার এমন কিছু আহ্লাদ হচ্ছে না। এখানে থাকবে আর বাবার মুখে চুনকালি দেবে। তাছাড়া আর কি করবে তুমি! আমি কি আর জানিনে?'

আমি বললাম, 'না না, আমি কিছু করব না।'

বাপী বললেন, 'না, ও কিছু করবে না।'

'ওঃ, তোমরা বাপ-বেটা মিলে ঘোঁট পাকিয়েছ! তাহলে আমি আর কে··· ?' মা একা পড়ে গিয়ে অভিমানের গলায় বললেন। হঠাৎ মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসা উথলে উঠল। বাপীর কোল থেকে নেমে গিয়ে মা-র কোলে উঠে বসলাম। মাকে আদর করে বললাম, 'আমি বাপীর কাছে থাকব না। তোমার

সঙ্গে যাব। দাদুর বাড়ি। বাঃ বাঃ, কি মজা! আমার দাদুর বাড়ি—আমার দাদুর বাড়ি!' আনন্দে হাততালি দিতে লাগলাম।

মা চোখের জল মুছলেন। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। বাপীর দিকে চেয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে আমার, লক্ষ্মী ছেলে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, কেমন! আমার সঙ্গে যাবে।'

মা-র কণ্ঠস্বরে বিজয়োল্লাস। বাপী উঠে বাইরে চলে গেলেন।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল অন্য রকম। যাওয়ার দিনে আমাদের সাজগোজ হয়ে গেছে। আমি মখমলের ওভারকোট আর হাফপ্যান্ট পরেছি। পায়ে ব্রাউন রঙের চকচকে জুতো। মা ঠাকুরঘরে গেছেন শেষবারের মতো ঠাকুরের পায়ে মাথা ছোঁয়াতে। এমন সময় বাপী আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বললেন, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় করমান নিয়ে যাব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'করমানে কি চিড়িয়াখানা আছে?'

'না।'

'করমানে ব্যাটারিতে-চলা মোটরগাড়ি আছে?'

'না।'

'তাহলে?'

বাপী মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'ভাবছি আমরা তিনজনে মিলে মাছ ধরতে যাব। তুমি, আমি আর তারা।'

'তারা যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে?' আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছি।

'চুপ, আস্তে।' বাপী তাড়াতাড়ি আমার মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বললেন, 'তোমার মা শুনে ফেলবে। আর শুনে ফেললে জোরজার করে নিয়ে যাবে তোমায়। কিন্তু যদি তুমি এখানে থাকতে রাজি হও, তাহলে আমি তারাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

আমি বড় কষ্টে আমার উত্তেজনা চেপে রাখতে চাইলাম, কিন্তু তবু আমার ঠোঁটের কোণে হাসি ঠিকরে পড়তে লাগল। আমার আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুটি আমার হৃদয়ের অব্যক্ত উত্তেজনা প্রকাশ করছিল। মা ঠাকুরঘর থেকে ফিরতেই আমি ঝট করে বললাম, 'না, আমি দাদুর ওখানে যাব না। বাপীর কাছে থাকব।'

মা আমাকে দেখলেন; তারপর তীক্ষ্ণ চোখে বাপীর দিকে তাকালেন।

বাপী চোখ নীচু করে বসে রইলেন।

'তুমি ওকে কিছু বলেছ?'

'না তো।'

'নিশ্চয়ই কিছু বলেছ। নইলে এই যাওয়ার সময় হঠাৎ মত বদলে গেলো কেন?'

'আমি রাহুর কাছে যাব না।' তিড়বিড় করে বললাম আমি।

বাপী বললেন, 'আমি তো কিছুই বলিনি ওকে। দিব্যি করে বলছি!'

'আমি যাব না, যাব না, যাব না।' একগুঁয়ের মতো আমি চিৎকার করতে লাগলাম।

মা রেগে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে মারার জন্যে হাত তুললেন। অমনি বাপী উঠে এসে তাঁর হাত ধরে ফেললেন। অনুনয় কণ্ঠে বললেন, 'রানু, তুমি যাচ্ছ আবার খোকাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে? একে তো তোমার যাওয়ার জন্যেই মনটা মুষড়ে পড়েছে তার ওপর যদি আমার কাছ-ছাড়া করে ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার দিন কাটানোই কঠিন হয়ে পড়বে।'

বাপীর গলা ভারাক্রান্ত হয়ে এল। হঠাৎ মা-র সব রাগ পড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার কাছ থেকে বাপীর কাছে চলে গেলেন। বাপীর বুকে মাথা রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আগে কেন এ কথা বলোনি আমায়? আমি অত জিদ করতাম না। যদি বলো, এখনও না-হয় আমিও যাব না!'

বাপী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না। এখন আর তা হয় না। আমি অত নিষ্ঠুর নই যে পাঁচ বছর পরেও তোমায় একবার বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে দেবো না। আমি কি মানুষ নই? আমি কি মেয়েদের মন বুঝিনে? তোমার মনে কি নিজের বাপ ভাই বোনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে না জেগে পারে! না-না ···যে-ক'টা দিন বাপের বাড়ি থাকবে তুমি, সে-ক'টা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দেবো।'

মা খুব খুশি হয়ে বললেন, 'আমি ছেলেকে রেখেই যাচ্ছি তোমার কাছে। কিন্তু কাকার কথা মনে থাকে যেন।'

'আমার নিজের ছেলে তো!'

'রোজ লাল সিরাপ খেতে দেবে।'

'রোজ খাওয়াব।'

'আর ক্যালসিয়ামের বড়ি।'

'আচ্ছা।'

'আর খাওয়ার পরে আয়রন টনিক।'

'ঠিক আছে।'

'বাইরে ঠাণ্ডায় বেড়াতে দিও না।'

'নিশ্চয়ই।'

'আর মুখপুড়ি তারার সঙ্গে খেলতে দেবে না। হতচ্ছাড়িটার মাথা তো উকুনে কিলবিল করছে। আমার ছেলের চুল উকুনে ভরে যাবে।'

বাপী যেন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে বাংলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবো না।'

মা বাপীর বুকে মাথা রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন যেন। তাঁর প্রশস্ত বুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তুমি সত্যিই কত ভালো!'

* * *

মা-র বেড়াতে যাওয়ার আট দিন পরে আমরা করমান পাহাড়তলির উদ্দেশে রওনা হলাম। যাওয়ার আগে বাপী তারার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। তারাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাজি করালেন তাদের। ওর জন্যে দু'জোড়া কাপড়-জামা তৈরি করানো হলো। গাঢ় লাল রঙের দুটি নতুন সালোয়ার, একটা কালো ছিটের জামা আর একটা নীল ফুলওয়ালা ছিটের জামা। গায়ে দেওয়ার জন্যে একটা নীল ও গোলাপী রঙের ওড়না। একদিন আগে আমাদের ঝি বেগমা ওকে বেশ করে নাইয়ে দিলো। তারপর ওর মাথার সব উকুন মেরে সুগন্ধী তেল দিয়ে চমৎকার করে বেঁধে দিলো। নতুন জামা-কাপড় পরে একা একটা খচ্চরের পিঠে বসে তারা এমন দেমাকের চোখে আমায় দেখতে লাগল, যেন আমি একটা চামারের ছেলে আর ও রাজার মেয়ে। খুব রাগ হলো আমার—হয়তো পিটুনিই লাগাতাম, কিন্তু বাপীকেই ভয়। কারণ তিনি ওর সঙ্গে বড় নরম গলায় কথা বলেন। পথে খাবার খেতে চাইলে সবার আগে ওকেই দেন, তারপর আমাকে। খচ্চরের পিঠে বসে থাকতে থাকতে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, পায়ে ঝিনঝিনি ধরে তখন বাপী আমার আগে তারাকেই খচ্চরের পিঠ থেকে নামান, তারপর আমাকে। তারপর এক হাতে তারার আঙুল ধরেন আর অন্য হাতের আঙুল আমার হাতে গুঁজে দেন। অনেকক্ষণ ধরে তারার সঙ্গে কথা বলতেই থাকেন। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না ওর। আমি ঠিক করেছি, করমান পৌঁছে তারাকে অবশ্যই পিটুনি দেবো। বাপী যতই ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন, ততই ওর ওপর ঘেন্না ধরে আমার। এখন মনে হচ্ছে, মা ঠিকই বলতেন। হতচ্ছাড়ি ডাইনীটাকে ত্যাখো, বাপীর কি-একটা কথা শুনে কি রকম হি-হি করে হাসছে! —আহা, মরে যাই! নোংরা চামারনী! মুখপুড়ি!

হঠাৎ আমার খচ্চরটা হোঁচট খেলো। আমি জিন থেকে লাফিয়ে উঠে খচ্চরের ঘাড়ের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি, সঙ্গে সঙ্গে খচ্চরওয়ালা মরকবান ধরে ফেলল আমায়। নইলে পড়েই যেতাম। তারা হাসতে হাসতে আমায় ঠাট্টা করতে লাগল।

সূর্যাস্তের আগেই আমরা করমান পাহাড়তলি পৌঁছে গেলাম। খুব ঠাণ্ডা এখানে। জোর হাওয়া দিচ্ছে। ছ' হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের ওপর প্রশস্ত প্রান্তর। চাপ-চাপ সবুজ কোমল ঘাসে ছেয়ে আছে। মাঠে একপাল ছাগল চরছে। প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে সুগভীর আশমা ঝিল। ঝিলের জল পশ্চিম পাড়টাকে ভেঙে একটা নদীতে গিয়ে পড়ছে। নীল জলের নদী ছোট ছোট নীল পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে। বাপী এই নদীতেই মাছ

শিকার করতে এসেছেন। যে পাড়টা নদী আর ঝিলকে আলাদা করে রেখেছে, সেই পাড়ের ওপর রাজাসাহেবের ডাকবাংলো। দশটি কি বারোটি সিঁড়ির ছোট একটা শান-বাঁধানো ঘাট। ঘাটের কাছে দুটো নৌকো বাঁধা রয়েছে। ডাক-বাংলোর পেছনে একটা বড় ওক গাছ। ও রকম আরও চার-পাঁচটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে—বেশ দূরে দূরে। গাছগুলো যেমন বড়, তেমনি ঝাঁকড়া। ওগুলোর নীচে মেষপালকেরা নিজেদের তাঁবু ফেলেছে। তাঁবুর বাইরে উনুন, আগুন জ্বলছে। উনুনের কাছে মেষপালকদের মেয়েরা মাথার দু'দিকে বেণী ঝুলিয়ে, কানে বড় বড় রুপোর বালী পরে মকাইয়ের রুটি তৈরি করছে। দৃশ্যটা আমার কাছে বড় আশ্চর্য ও সুন্দর মনে হলো।

ডাকবাংলোর কাছে এসে আমরা খচ্চরের পিঠ থেকে নামলাম। তিনটি খচ্চর আমাদের। খচ্চরের পিঠে তাঁবু, ছোলদারী (চাকর-বাকরদের থাকার জন্যে ছোট তাঁবু), খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্র। দু'জন আরদালী আর দু'জন চাকর ডাকবাংলোর বাইরে খুঁটি পুঁতে তাঁবু ও ছোলদারী খাটাতে লেগে গেলো। আর আমরা তিনজন চৌকিদারের সেলামের জবাব দিতে দিতে ডাকবাংলোর ভেতরে চলে গেলাম। একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে এল। জানলার পর্দাগুলো ঝোড়ো হাওয়ায় ঝটপট করছে। বাপী উঠে গিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানা পাতা হলো। তারপর খেয়ে নিলাম আমরা। বাপী বার-বার আমার ও তারার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন। এভাবে খাবার খেতে বড় মজা পাচ্ছিলাম আমরা। তারপর বাপী আমাদের দু'জনকে কোলে নিয়ে খুব চমৎকার এক পরীর গল্প শুরু করলেন। গল্প শুনতে শুনতে আমাদের চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে এল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারার হাত আমার গলায়। সে আমার খুব কাছ ঘেঁষে ঘুমিয়েছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। এক কোমল উষ্ণ অন্ধকার আমাদের কোলে তুলে নিল যেন। তারপর আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, নতুন নতুন দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু অমন নিষ্পাপ সুমধুর মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা আমার জীবনে আর কখনও আসেনি। এখনো মাঝে-মাঝে নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরিয়ে যখন কোনো অপরিচিত সরাইখানায় একা শুয়ে থাকি, তখন হঠাৎ মনে হয়, তারার ছোট্ট হাত রয়েছে আমার গলায়। হঠাৎ চমকে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায়, উঠে বসি। শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে ব্যাকুল ও বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমার চারদিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে, বন্ধ জানলায় কারোর করাঘাতের শব্দ। আর আমি ভাবতে থাকি—আজ সেই ছোট্ট ছোট্ট হাত দু'খানা কোথায়! জানিনে, আজ সে জীবনের যাত্রাপথে কাকে নিজের সঙ্গী বেছে নিয়েছে! জানিনে, কার ছেলে কোলে নিয়ে আদরে সোহাগে অস্থির করে তুলছে তাকে। আমার গলার সঙ্গে তার হাতের কি আর সম্পর্ক এখন? এ কথা আমি আজও বুঝতে পারিনে।

পরদিন সকালে উঠে বাপীকে তাঁর বিছানায় দেখতে পেলাম না। জানলাগুলো খোলা। পর্দাগুলো মৃদু মৃদু দুলছে। সকালের তাজা মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে আমাদের বিছানায়। বাবুর্চি আমাদের বিছানাতেই প্রাতরাশ এনে দিলো। তারা এমন করে খেতে লাগল, যেন সে সারা জীবন কিছু খায়নি। তারপর একজন আর্দালি আমাদের গরম জলে বেশ করে নাইয়ে দিলো। বাসী কাপড় পাল্টে নতুন কাপড় পরিয়ে দিলো। তারপর আমার বাক্স থেকে রবারের বল বার করে নিয়ে আমরা লাফাতে লাফাতে নদীর দিকে চললাম, যেখানে বাপী সকালে উঠেই মাছ ধরতে চলে গেছেন।

বলটা ঘাসের ওপর গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে, আমি আর তারা পেছনে পেছনে খুশিতে চিৎকার করতে করতে ছুটছি। ঘন চাপ-চাপ ঘাস। যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন ঘাসের নীচে আমাদের দোকার স্প্রীং লাগানো রয়েছে। দৌড়তে দৌড়তে এক জায়গায় অপরাজিতার নীল নীল ফুল চোখে পড়ল। ফুলগুলোর ওপর তারাকে ফেলে দিলাম। তারপর আমিও শুয়ে পড়লাম। গড়াতে গড়াতে ফুলের বিছানা থেকে ঘাসের ওপর চলে এলাম আমরা। ঘাসের ওপর গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চললাম। আমাদের চোখে আকাশ ও পৃথিবী ঘুরছে যেন। তুত গাছটা যেন আমাদের চোখের সামনে বড় হতে হতে হঠাৎ ডিগবাজি খাচ্ছে। আকাশ ঘুরতে ঘুরতে স্রোতস্বিনী নদীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নদী উছলে উঠে ফুলগুলোর ওপরে এসে পড়ছে। আর সব কিছুর ওপর ঝরে পড়ছে সোনালী রোদ্দুরের ঝর্ণা।

গড়াতে গড়াতে আমরা নার্গিস ফুলের একটা বড় ঝোপের দিকে এগিয়ে চললাম। কেন না, আমাদের বলটা ওদিকেই চলে গেছে। হঠাৎ একটা কালো কুকুর নার্গিস ফুলের ঝোপটা লাফ মেরে ডিঙিয়ে কোত্থেকে এসে হাজির হলো। আচমকা বলটা মুখে তুলে নিয়ে চোখের পলকে নার্গিসের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। যেখান দিয়ে কুকুরটা চলে গেছে, সেখানে এখনো পর্যন্ত নার্গিস ফুলের লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো নুয়ে আছে। ফুলগুলোর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাদের বলটা হারিয়ে যাওয়াতে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে ওরা।

আমি তারার দিকে তাকালাম; তারা আমার দিকে। তারপর আমরা ঘাস থেকে উঠলাম। দু'জনে হাত ধরাধরি করে আস্তে আস্তে নার্গিসের ঝোপটার ওপাশে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালাম, যেদিকে কুকুরটা গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে ভয়। কেন না, কুকুরটা যেমন কালো তেমনি বড়।

ঝোপটার ওপাশে যেতেই হঠাৎ নদীর পাড় চোখে পড়ল। পাড়ে একটা লোক বসে রয়েছে। কুকুরের মুখ থেকে বলটা নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। ওর হাতে আমার তিন রঙের চমৎকার বলটা। ওটা আমার খুব পছন্দ। লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটা আমাদের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

লোকটা আমাদের মতো দুটি শিশুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কালো।' কুকুরটা চুপ করে লেজ নাড়তে লাগল।

লোকটা ভারী আশ্চর্য ধরনের। কোমর পর্যন্ত খালি গা। কোমর থেকে একটা কালো চুস্ত পায়জামা। পায়জামাটা কেবল হাঁটু পর্যন্ত। হাঁটুর নীচের অংশ অনাবৃত। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত একটা পৈতে ঝুলছে। লোকটা ধবধবে ফর্সা। চোখ গাঢ় নীল। মুখে ছোট ছোট লালচে দাড়ি। সে বলটার ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে আমাদের দিকে চেয়ে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় কেটে গেলো। বললাম, 'বলটা আমার। আমায় দাও।'

বলটা তার হাত থেকে নীচে পড়ল। নীচে পড়তেই বার দু'তিন লাফাল সেটা। তৃতীয় বারে কুকুরটা আবার লুফে নিল ওটাকে। বলটাকে আপনা থেকেই লাফাতে দেখে লোকটা খুব হাসতে লাগল, যেন জীবনে রবারের বল এই প্রথম দেখল সে।

'আমার বল আমায় দিয়ে দাও।' বেশ কড়া গলায় বললাম আমি।

ও ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে বলটা ছুঁড়ে দিলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলাম। ও খুব আশ্চর্য হয়ে বলটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কিসের তৈরি ?'

'রবারের।'

'রবার কি ?'

'তোমার মাথা।' বেশ মেজাজের সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

লোকটা খুব কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে না ?'

আমি বেশ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপী কোথায় ?'

ও বলল, 'ওই যে মাঠের ধারে শেষ তড গাছটা দেখা যাচ্ছে, ওইখানে উনি মাছ ধরছেন।'

আমি গাছটার দিকে লক্ষ্য করতে করতে বললাম, 'কই চোখে পড়ছে না তো ?'

'উনি গাছটার ওপাশে রয়েছেন। চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিচ্ছি।' এই বলে সে নদীর পাড় থেকে একটা কাঠের বোঝা মাথায় তুলে নিল। তারপর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

আমরা তো দৌড়তে দৌড়তে লোকটার আগেই বাপীর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি নদীতে বিলেতী ছিপ ফেলে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তন্ময় হয়ে বসে রয়েছেন। চেয়ে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন বোঝাই যাচ্ছে না। আমাদের তো মনে হলো ঘুমিয়েই আছেন। কারণ আমরা এসে পড়তেই তিনি যেন একেবারে চমকে উঠলেন। আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা এসে পড়লে ? ব্যস, হয়ে গেলো মাছ ধরা !'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

'তোমাদের গোলমালে মাছ কি আর থাকবে ? সাবধান হয়ে সটকে পড়বে না !'

আমি মাছ দেখার জন্যে জলের দিকে তাকালাম। জল খুব গভীর নয়। জলের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জলের নীচে সাদা ঝকঝকে কাঁকর-বালি পর্যন্ত। রোদ্দুর গাছের পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলে পড়ছে। মাছগুলো সেই আলোতে কখনো ঝকঝক করে উঠছে; কখনো গভীর ছায়াান্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা দুটি তিনটি করে দল বেঁধে তিরতির করে সাঁতার কাটছে। এক জায়গায় একটা বড় নীল পাথরের চারপাশে দুটি মাছ ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ মাছ দুটো পাথরের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'মাছগুলো গেলো কোথায় ?' আমার মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে এল কথাটা।

বাপী বললেন, 'ওই পাথরটার নীচে ওদের ঘর আছে। নীল পাথরের ছাদ, ছাদের নীচে ঝকঝকে বালির সুন্দর বিছানা। সারাদিন ওরা এই জলে সাঁতার কাটে। জল থেকেই নিজেদের খাবার যোগাড় করে।'

তারা হাত জোড় করে বলল, 'আহা, আমার ইচ্ছে করছে, আমিও একটা মাছ হয়ে ওই রকম সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই।'

বাপী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কালো কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটা এল। মাথায় কাঠের বোঝা। বাপীকে সালাম করল। বাপী ওর পৈতেটার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ ?'

'আজ্ঞে।'

'তোমার নাম কি ?'

'ভোলা।'

'এই কুকুরটা কি তোমার ?'

'আজ্ঞে।'

'তুমি কি করো ?'

'ডাকবাংলোয় কোনো অফিসার এলে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে দিই।'

'আর যখন কোনো অফিসার থাকে না ?'

'তখন এই কাঠ বকরীওয়ালাদের কাছে বিক্রী করি।'

'আর যখন এই পাহাড়তলির ঘাস শুকিয়ে যায়, বকরীওয়ালারা অন্য পাহাড়-তলিতে চলে যায়, তখন কি করো ?'

ভোলা মাঠের পেছনে ঢালুটার দিকে ইশারা করে বলল, 'ওই যে ঘরটা দেখছেন, ওর আশপাশের সব জমি আমার। অনেক জমি নদীর গর্ভে চলে গেছে। কিন্তু যেটুকু বেঁচেছে, তাতেই চাষ-বাস করি।'

'ওই পাহাড়ী জমির পাথুরে মাটিতে কি ফলে ?'

'মকাইয়ের চাষ করি।'

বাপী চুপ করলেন। মাথা নীচু করে ছিপের সুতো গুটোতে লাগলেন। লোকটা কিছুক্ষণ আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলো।

বাপী জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকা, তুমি চাষীর ঘর দেখেছ?'

'না বাপী।'

'চলো, তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

ভোলার ঘর দেখলাম। চারটি দেওয়াল মাটির, ছাদ মাটির, ওপরে পাতার ছাউনি। ঘরে কোনো জানলা নেই। শুধু একটা দরজা। একটা অন্ধকার কোণে উনুন। উনুনের ওপর একটা নীল পাথর চাপানো, পাহাড়ী ভাষায় তাকে 'তরাড়' বলে।

বাপী জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই তরাড়টা কি জন্যে?'

ভোলা বলল, 'ওটা তরাড় নয়, তাওয়া।'

'পাথরের তাওয়া?' বাপী আশ্চর্য হয়ে বললেন।

ভোলা আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'ওতে রুটি সেঁকি আমরা।'

'ওতে রুটি সেঁকা হয়?' বাপী জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখলে তো, চাষীর ঘর কেমন?'

আমি বললাম, 'কিন্তু ঘরে তো কিছুই নেই!'

'কি কি আছে, সেই হিসেব করে চাষীর ঘর চেনা যায় না। বরং কি কি নেই, তাই দেখতে হয়।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাইরে থেকে কুকুরটার ভীষণ ঘেউ ঘেউ আওয়াজ এল। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, দেওয়ালটার কাছে যেখানে ভোলা কাঠের বোঝাটা নামিয়ে রেখেছিল, সেখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। কাঠের বোঝাটা তার মাথায়। তার পথ আগলে কালো ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করছে।

ভোলা এসেই কালোকে তাড়িয়ে দিলো। কালো বেশী দূরে গেলো না, একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল। মেয়েটি ভোলাকে দেখা মাত্রই তার চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি সে কাঠের বোঝাটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। অমনি ভোলা তার হাতটা ধরে ফেলল খপ করে। বলল, 'তুই আমার কাঠ চুরি করতে এসেছিস, না?'

মেয়েটি আস্তে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তার দু' চোখে দারুণ ভয়। কালো মুখখানা যেন হলদে হয়ে গেছে। ভয়ে তার পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আমাদের সবাইকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সে। চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে তার।

ভোলা জিজ্ঞেস করল, 'বকরীওয়ালাদের মেয়ে তুই?'

মেয়েটি আবার মাথা নাড়ল।

'তোর নাম?'

'তুবৃঙ্গা।'

বাপী জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কাঠ চুরি করতে এসেছিস কেন?'

'রুটি তৈরি করবার জন্তে।'

'তো নিজে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনিস না কেন?'

'জঙ্গলে যেতে আমার ভয় করে।'

'নিজের ভাই-টাই কাউকে পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

'আমার ভাই নেই, শুধু মা আছে—বুড়ো মানুষ। আমি সারাদিন ভেড়াগুলোর জন্তে ঘাস-পাতা যোগাড় করি। মা রুটি তৈরি করে। জঙ্গলে কে যাবে?'

'তাহলে আগে কে যেতো?'

'মাহু।'

মাহু কে, সেটা আমাদের কারোরই জানা ছিল না। ভোলা বললে, 'তাহলে মাহুই গেলো না কেন আজ?'

মেয়েটি চোখ নামিয়ে নিল। পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মাহু বিয়ে করেছে।'

ভোলা অনেকক্ষন তুবৃঙ্গার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অবশেষে সে কাঠের বোঝাটা মেয়েটির মাথায় তুলে দিলো। তারপর বলল, 'নে, আজ নিয়ে যা। আর কখনও চুরি করিসনে কিন্তু।'

ভোলা-চাষীর ঘর থেকে ফিরে এসে বাপী আবার তুঙ গাছটার গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসলেন। বঁড়শীতে একটা ছোট্ট কেঁচো লাগাতে লাগাতে বললেন, 'চারটে ক্যাড়া-মুড়ো দেওয়াল, একটা খালি মেঝে, পাথরের তাওয়া—দেখলে তো কাকা, ওই সব নিয়েই একটা চাষীর কেমন সহজ সরল জীবন, ঠিক একটা মাছের মতোই।'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ভোলা তো মাছ নয়, জ্যাঠামশাই!'

বাপী বড় বিষন্ন কণ্ঠে বললেন, 'হ্যা মা, মাছ নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি, মাছ থেকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্তে মানুষকে যে লক্ষ লক্ষ বছরের পথ অতিক্রম করে আসতে হলো, সেটা কি জন্তে?'

তারপর বাপী আমাদের সঙ্গে আর কথা বললেন না। আর বলতে কি, কথাগুলো আমাদের লক্ষ্য করে বলছিলেনও না যেন। সে জন্তে আমরাও বাপীকে নিশ্চিন্তে মাছ ধরতে দিয়ে আমাদের বল নিয়ে সেখান থেকে দূরে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে খেলতে চলে গেলাম।

আমার বাপী বড় আশ্চর্য মানুষ। মাঝে মাঝে এমনি কথা বলে ফেলেন, যা কারোর মগজেই ঢোকে না।

এই ঘটনার তিন দিন পরে আমরা আশমা ঝিলের ধারে পদ্মফুলের মালা গাঁথছিলাম। আজ বাপী আমাদের ঝিলে নৌকো করে বেড়িয়ে এনেছেন। ঝিলের জলে বড় বড় পাতার ওপর পদ্ম ফুটে ছিল। সাদা ও গোলাপী রঙের ফুলগুলো দেখে তারার ভীষণ লোভ হয়েছিল। বাপী অনেক ফুল তুলে দিয়েছিলেন ওকে। ঝিলের জল যেখানে নদীর জলে গিয়ে মিশেছে, সেখানে বসে বসে আমরা এখন সেই ফুল দিয়ে মালা গাঁথছি। ডাকবাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে তারা ছুঁচ সুতো চেয়ে এনেছে। খুব নিপুণ হাতে মালা গাঁথছে সে। মালা গেঁথে একটা সে নিজের গলায় পরল, আর একটা আমার গলায় পরিয়ে দিলো। বাড়তি ফুলগুলো নিজের মাথার চুলে গুঁজে নিল। তাকে এখন দেখে মনে হচ্ছে ঝিলের রাণী।

এমন সময় ভোলা তার কুকুর নিয়ে ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের খেলতে দেখে দাঁড়াল সে। তার হাতে একটা ছোট্ট কাঠের পানচাক্কি। আমাদের কাছে বসে নদীর ধারে দুটো পাথরের মাঝখানে কাঠের পানচাক্কিটাকে আট্‌কে দিলো। দুটো পাথরের মাঝখানে ভালোভাবে আট্‌কে যেতেই ওর চাকাগুলো জলে পনপন করে ঘুরতে লাগল। ঠিক আটা-পেষা পানচাক্কির মতোই।

তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি ওই পানচাক্কিটা নেব—আমি পানচাক্কিটা নেব।'

আমি বললাম, 'না মশাই, আমি নেব। ভোলা, ওই পানচাক্কিটা আমার।'

ভোলা বলল, 'আমার কাছে দুটো পানচাক্কি রয়েছে। আমি দু'জনকেই একটা করে পানচাক্কি দিতে পারি।'

আমি অধীর হয়ে বললাম, 'তাহলে শিগ্‌গির বার করো।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমাকে দিতে হবে।'

'কি?'

'ওই রবারের বলটা।'

আমি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'না না, আমি রবারের বল দেবো না। কক্ষনো দেবো না।'

তারা লুব্ধ দৃষ্টিতে তখনো পানচাক্কিটার দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আদেশের সুরে বলল, 'কেন দেবে না? অমন বল তো তোমার কাছে দুটো রয়েছে!'

আমি জিদ্ ধরে বললাম, 'না, আমি দেবো না। দেবো না তো বটেই, এই পানচাক্কিটাও নেবো।'

'আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে।' ভোলা পাথর দুটোর মাঝখান থেকে পানচাক্কিটা তুলে নিতে নিতে বলল।

তারা বেশ জোর দিয়ে বলল, 'না-না, ওটা ওখানেই রাখো।' তারপর আমায় ভয় দেখাল তারা, 'বলটা ওকে দিয়ে দাও মশাই। নইলে তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আর কক্ষনো কথা বলব না। একেবারে আড়ি।'

শেষ পর্যন্ত আমায় বলটা দিতে হলো। আমি বুঝতেই পারছিলাম না, কি করব! একদিকে তারা গোঁ ধরে বসে আছে, ওদিকে পানচাক্কি ঘুরছে, অন্যদিকে আমার চমৎকার বলটা! অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলটা দিয়ে দিলাম ভোলাকে। ভোলা অন্য পানচাক্কিটাও নদীর ধারে দুটো পাথরের মাঝখানে ওইভাবে আটকে দিলো। সেটা যেই ঘুরতে শুরু করল, অমনি সে তাড়াতাড়ি চলে গেলো ওখান থেকে —যদি আমার মতটা হঠাৎ পাল্‌টে যায়, সেই ভয়ে।

আমি তারাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ও লোকটা বল নিয়ে কি করবে বল তো? বড়রা তো কখনও খেলে না। আমি বাপীকে তো কখনও বল নিয়ে খেলতে দেখিনি।'

'বাঃ বাঃ, আমার পানচাক্কিটা তোমারটার চেয়ে বেশী ঘুরছে।' তারা আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলল। ও আমার বলটার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

এক নম্বরের ডাইনী কোথাকার!

আমি রেগে গিয়ে তারার চুল ধরে খামচে দিলাম। তারপর ওর বেণী ধরে খুব পিটুনি লাগালাম। বলটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

দিনভর আমাদের আড়ি চলল। কিন্তু রাত্তিরে চা খাওয়ার সময় আপস হয়ে গেলো। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় ভোলা মাথায় কাঠের একটা ভারি বোঝা নিয়ে এসে হাজির হলো। কাঠের বোঝাটা সে বারান্দার নীচে মাটিতে ঘাসের ওপর ফেলে দিলো। তারপর ঘাম মুছতে মুছতে বারান্দার মেঝেয় আমাদের পায়ের কাছে বসে জিরোতে লাগল।

বাপী ওকে দু' কাপ চা দিলেন। তারপর এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। চা খেয়ে ভোলা যখন একটু সুস্থ হলো, তখন সে উঠে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বাপীকে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, লোহার তাওয়ার দাম কি রকম পড়বে?'

'মনে হয়, দু'আড়াই টাকা লাগবে। কেন?'

'কিছু না। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

ভোলা মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর যখন ওখান থেকে চলে গেলো, তখন বাপী আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

দু'দিন পরে আমরা জানতে পারলাম, ভোলা বলটা নিয়ে কি করেছে। আমি আর তারা নার্গিসের উঁচু উঁচু ডাঁটাওয়ালা গাছগুলোতে খেলছিলাম। আমরা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ তারা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'চুপ। ওই ছাখো।'

'কোথায়?'

তারা আমার সামনে থেকে নার্গিসের কয়েকটি ডাঁটা সরিয়ে দিলো। সামনেই নদীর পাড় চোখে পড়ল। তুরুজ্জা নদীর ওপারে জলে পা দুটো ডুবিয়ে আমার

বলটা নিয়ে খেলছে। বলটা বারবার লাফিয়ে উঠে তার হাতেই ফিরে আসছে। আর তুরুজা হাসতে হাসতে গুন্‌গুন করে গান গাইছে। যেখানে আমরা লুকিয়ে বসে এই মজা দেখছি, সেখানে অবশ্য কারোর নজর পড়বে না।

আমি বললাম, 'আমার বলটা তুরুজার কাছে গেলো কি করে?'

তারা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ছি-ছি, তুমি আস্ত একটা বুদ্ধু! বলটা তো তোলাই দিয়েছে তুরুজাকে।'

আমি খুব রেগে গিয়ে বললাম, 'বটে! তোলা আমার বল ওকে দিলো কেন? দাঁড়াও, এখুনি আমি ওর কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিয়ে আসছি।'

আমি নিজের জায়গা থেকে উঠতে যাব, হঠাৎ তারা 'চুপ' বলে আমায় আবার নিজের কাছে টেনে নিল। দেখতে পেলাম, তোলা মাথায় একটা কাঠের বোঝা নিয়ে এ দিকেই আসছে যেখানে আমরা লুকিয়ে বসে আছি। তুরুজা ওকে দেখতে পেয়ে আপনা থেকেই হাসতে শুরু করল। তারপর সে বলটা তার জামার পকেটে পুরে নিয়ে তাড়াতাড়ি নদীর জলে নেমে পড়ল। সালোয়ারটা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে নিয়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে এ পারে চলে এল। এসে তোলার কাছে দাঁড়াল। তার পায়ের আধখানা তখনো অনাবৃত, জলে ভেজা। তোলা তুরুজাকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

তুরুজা কাছে এসে দাঁড়াতেই তোলা তার চোখে চোখ রাখল। অনেকক্ষণ ওইভাবেই ওরা পরস্পরকে দেখতে থাকল।

আমি তারাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কোনো কথা বলছে না কেন?'

'চুপ!' তারা রেগে গিয়ে আমার মুখে হাত চাপা দিলো।

তোলা দু'হাতে নিজের কাঠের বোঝাটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে সেটা তুলে খুব সাবধানে তুরুজার মাথায় চাপিয়ে দিলো।

তুরুজা মাথায় বোঝাটা নিয়ে দ্রুত এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'তুত গাছের তলায় সন্ধ্যেয় দেখা করব। ওই ঢালুতে যে তুত গাছটা রয়েছে, ওখানে।'

'ভুলবি নে কিন্তু!'

'উঁহু। আমি তোমার জন্যে মকাইয়ের রুটি, মাখন আর লাউয়ের শাক নিয়ে আসব। আচ্ছা, আমি যাই এখন। কেউ দেখে ফেললে যদি!'

'একটু দাঁড়াও না?'

'না, কেউ দেখে ফেলবে।' বলেই তুরুজা তাড়াতাড়ি নদী পেরিয়ে চলে গেলো। তোলা নদীর এ পাড়ে বসে পড়ে তুরুজার চলে যাওয়া দেখল।

আমি তারাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ দেখে ফেললে কি হতো?'

তারা অনেক ভেবেচিন্তে বলল, 'হয়তো ওরা তুরুজার কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিত!'

আমাদের এখানে আসা আট দিন হয়ে গেলো। এ জায়গাটা আমাদের এখন আর মোটেই ভালো লাগছে না। জায়গাটা বড় রহস্যজনক মনে হচ্ছে। কিন্তু এই গত আট দিনে আমরা সব কিছু তন্নতন্ন করে দেখেছি। এখন জায়গাটা রোজই একঘেয়ে লাগছে, ঠিক একটা বলের মতো ছোট্ট মনে হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে কালকেই বাপীর কাছে জিদ ধরব, তারাও আমায় সমর্থন করবে।

গত দু'দিন হলো সর্দার কৃপাল সিং মুশিরমালও এসে পড়েছেন। তিনি কোথায় দূর দেশে যাচ্ছেন, বাপীর কাছে দু'দিন থেকে যাবেন। থাকার জন্যে বাপীই পীড়াপীড়ি করেছিলেন ওকে। দুই বন্ধু সারাদিন দাবা খেলেন। দাবার নেশায় মেতে বাপী মাছ ধরার কথা বেমালুম ভুলেই গেছেন।

তৃতীয় দিন সর্দার কৃপাল সিং বাপীর কাছে বিদায় চাইলেন। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা হয়ে গেছে। অনেক দূর যেতে হবে তাঁকে। বাপীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। সকালবেলা, দারুণ শীত। বারান্দার নীচে ওঁর ঘোড়া ও খচ্চর চিঁ-হি-হি করে ডাকছে। মজদুররা বোঝা বইছে। এমন সময় এক আর্দালি দৌড়তে দৌড়তে এসে মুশিরমালের সামনে হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, একজন বেগার কম হচ্ছে। রাতে এক বেগার-চাষী পালিয়ে গেছে।'

মুশিরমাল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ ভোলার ওপর তাঁর চোখ পড়ল। ভোলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনেছিল, এখন বারান্দায় বসে জিরোচ্ছে। মুশিরমাল হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ওকে নিয়ে নে।'

ভোলা চমকে উঠে দাঁড়াল, 'না হুজুর, না। আমি যাব না। এখানে আমার কাজ আছে।'

'কাজের বাচ্চা!' মুশিরমাল রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। ভোলার পিঠে এক জোর থাপ্পড় কষিয়ে বললেন, 'ওঠ শুয়োরের বাচ্চা!'

ভোলা উঠেই দৌড় দিলো। দু'জন আর্দালি ওর পেছনে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ধরে ফেলল। মুশিরমাল হুকুম দিলেন, 'শালার মাথায় দু'জুতো মার।'

ভোলার গায়ে মাথায় এমন জুতো মারা হলো যে তার সারা গা নীল হয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমি যাব না। আমি যাব না।'

মুশিরমাল হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'শালা, বেগার দিবি নে তো এখানে রাজা-সাহেবের রাজত্ব চলবে কি করে? ওর মাথায় বোঝা তুলে দে আর পাছায় লাথি মার।' দু'জন লোক ওর মাথায় বোঝা তুলে দিলো, তারপর থাপ্পড় মারতে মারতে নিয়ে চলল ওকে। ভোলা বারবার পেছন ফিরে দেখছে আর কাঁদছে।

ভোলার ওপর বড় মায়া হলো আমার। ভোলা চলে গেলে আমি বাপীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকাবাবু ভোলাকে মারল কেন?'

বাপী বললেন, 'ও বেগার দিতে চায়নি বলে। এখানে প্রত্যেক চাষীকে বেগার দিতে হয়। এটা সরকারী আইন।'

'আইন কি করে হয় বাপী?'

বাপী বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'রাজা যা বলেন, তাই আইন।' বাপী ভেতরে চলে গেলেন। আমার মনে হলো, উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করছেন না।

সেই রাত্তিরে তুবুজা হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকিদারের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ভোলা কোথায়?'

'এখানে নেই।' দড়ি পাকাতে পাকাতে চৌকিদার জবাব দিলো। ভারি চমৎকার দড়ি তৈরি করছিল সে। আমি আর তারা দু'জনে দেখছিলাম।

'কোথায় গেছে?'

'ওই দিকে গেছে।' উত্তর দিকের পাহাড়টার দিকে ইশারা করে দেখাল চৌকিদার।

তুবুজা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবে আসবে?'

চৌকিদার দড়ি পাকাতে পাকাতে বলল, 'কি জানি কবে আসবে। দশ দিন পরে আসতে পারে। আবার বিশ দিনও হতে পারে। সরকারী বেগার দিতে গেছে। মালিক যেদিন ছাড়বে, তখন আসবে।'

তুবুজা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। চৌকিদার অনেকক্ষণ ধরে দড়ি পাকিয়ে চলল। ওর মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে, রাগে মুখটা থমথম করছে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

তুবুজা বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, 'আমরা বকরীওয়ালারা কালকেই এই পাহাড়গুলি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

চৌকিদার কোনো উত্তর দিলো না।

'আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু ভোলা যদি এখানে থাকত...'

তবুও চৌকিদার কোনো কথা বলল না।

তুবুজা সেখান থেকে উঠে নদীর ধারে গিয়ে বসল। বসে বসে আমার বলটা নিয়ে খেলতে লাগল। খেলছিল আর কাঁদছিল। কিছুক্ষণ পরে বলটাকে নিজের বুকে ছুঁইয়ে জোরে নদীর জলে ছুঁড়ে দিলো। বলটা নদীর ঢেউয়ে লাফাতে লাফাতে অনেক দূরে ভেসে চলেছে। যখন সেটা আর চোখে পড়ছে না, তখন কপালে হাত দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সে। দৃষ্টির সীমানা থেকে সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়তে দৌড়তে বকরীওয়ালাদের তাঁবুর দিকে চলে গেলো।

রাত্তিরে বাপী অস্বাভাবিকভাবে চুপ মেরে থাকলেন। আমরা গল্পের ফরমায়েশ করলাম, কিন্তু তিনি গল্প না শুনিয়ে বললেন, 'আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালেই ফিরে যাব আমরা।'

তিন

পাহাড়ী এলাকায় গ্রীষ্মকালের দুপুর বড় ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল। এমনি দুপুরবেলায় বাপীর অভ্যেস খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ভাত-ঘুম সেরে নেওয়া। খেয়ে-দেয়ে তিনি নিজের কামরায় চলে যান। মা এক হাতে পাখা নাড়েন, অন্য হাতে আস্তে আস্তে বাবার পা টিপে দেন। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। মাঝে মাঝে আমাকেও ঘুমনোর জন্যে জোর-জবরদস্তি করেন ওঁরা। চোখ আধ-বোজা করে ঘুমোবার চেষ্টা করি। বলতে কি, পিটপিট করে তাকিয়েই থাকি। কখনো কখনো ঘুম এসে যায়, আবার কখনো কখনো মা যখন পায়ের দিকে বসে বসে ঝিমোতে থাকেন, তখন চুপি-চুপি উঠে বাইরের বাগানে চলে যাই। আমি বুঝতেই পারিনে বড়রা দিনের বেলা কেন ঘুমোয় —রাতে ঘুমোয়, আবার দিনেও ঘুমোয়!

এমনি এক ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল দুপুরে মায়ের চোখ এড়িয়ে আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে মালীর ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম। সেদিন বুঝি গরমটা একটু বেশী ছিল। বাগানের ফুলগুলো ঢলে পড়েছে। ফুলে একটা প্রজাপতিও নেই যে ধরার চেষ্টা করব। মালীর কুকুরটা ঘরের বাইরে ঘুমোচ্ছে, মালীও ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

কার সঙ্গে খেলা যায়? কি করে খেলা যায়? —এ প্রশ্নটা ছোটদের জীবনে অত্যন্ত গুরুতর, যে রকম বড়দের জীবনে প্রশ্ন দেখা দেয়, কাজটা হাসিল করা যায় কি করে? আমার অল্প বয়সে এ রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে হতাশ হয়ে পড়তাম। এমন চমৎকার দুপুর, অথচ লোকগুলো ঘুমোচ্ছে। আমার সঙ্গে খেলার জন্যে কেউ নেই।

আমার মনে হলো, দিনে যারা ঘুমোয়, তারা সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ ও সুন্দর পৃথিবীকে অপমান করে। দূরের পাহাড় থেকে বয়ে আসা সুমধুর হাওয়া মানুষের শরীরে অনবরত শুড়শুড়ি দিয়ে অস্থির করে তুলছে, এমন চমৎকার সময় কি আর পাওয়া যাবে! অথচ লোকগুলো ঘুমোচ্ছে। আমরা যতদিন শিশু থাকি, ততদিন ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আর শুকনো-বাসি খাবার খেয়েও হেসে খেলে বেড়াই, অনর্গল খলখল হাসিতে পৃথিবী ভরে তুলি। কিন্তু বড় হয়ে আমরা খেলাধুলো একদম ভুলে যাই; ভরপেট খেয়েও শুয়োরের মতো মুখ করে ঘুরে বেড়াই। যেন পেটের মধ্যে খাবার পুরে দেওয়া হয়নি, লোহার পেরেক ঠোকা হয়েছে। শৈশবে এর বিপরীত অবস্থা দেখে খুব ভাবতাম। এখন আর ভাবিনে।

এখন তো জানি, মানুষের অর্ধেক কষ্ট ক্ষুধা থেকে, বাকী অর্ধেক মানুষ খেলাধুলো ভুলে যায় বলে।

সারা বাগানটা টো-টো করে ঘুরে হয়রান হয়ে চুনার গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। ওপর থেকে নীচের বিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকালাম। উপত্যকার মাঝখানে দুটি শহতুতের গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। গাছগুলোর ছায়ায় ভেড়াগুলো আরাম করছে। রাখাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কোলের কাছে একটা ছাগল-ছানা নিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা ছোট্ট মেটে পথ একা একা নদীর দিকে চলে গেছে, পথিকের পদস্পর্শ না পেয়ে সে যেন ব্যথাতুর। পথটাকে অনুসরণ করে নদীর ধার পর্যন্ত নজর গেলো আমার।

পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার কয়েক ফুট নীচে নদীর খাদ। লোকেরা নদীর ওপর পাথরের বাঁধ দিয়েছে। বর্ষার সময় বাঁধের ওপর দিয়ে জল বয়ে যায়। কিন্তু শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে বাঁধটা কাজে লাগে। চওড়া বাঁধের ওপর দিয়ে ঘোড়া, খচ্চর ও পথচারীরা যাতায়াত করে। রাখালেরা নদী পেরিয়ে জঙ্গল থেকে ঘাস-পাতা সংগ্রহ করে সন্ধ্যাবেলা ওই বাঁধের ওপর দিয়েই ফিরে আসে। পশুদের গলায় টুং-টাং ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টার শব্দ পশুদের পদক্ষিপ্ত ধূলিপটলের সঙ্গে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে—সোনালী গোধূলি-রাঙা মেঘের স্পর্শে আকাশ খোবানির মতো লজ্জায় লাল হয়, ঠিক যেন কোনো অনূঢ়া কুমারী কোনো এক অপরিচিত পুরুষের কথা ভেবে রাঙা হয়ে ওঠে।

বাঁধটার দু' দিকে নদীর নীচে ও ওপরে দুটি ছোট ছোট ঝিল তৈরি হয়েছে। পাহাড়ী ভাষায় আমরা এগুলোকে 'ডাব' বলি। নদীর নীচের ডাবটাকে 'ভোঙা ডাব' বলা হয়। কারণ এতে জল বেশী থাকে—যেমন গভীর তেমনি বিপজ্জনক। এতে পুরুষরা স্নান করে। ওপরেরটা 'সরু ডাব', তাতে মেয়েরা স্নান করে। মাঝখানে উঁচু বাঁধ। অবশ্য এ সব ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই, আইনও নেই, কিন্তু এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুল করেও কোনো পুরুষ 'সরু ডাবে' নাইতে যায় না, তেমনি কোনো মেয়েও 'ভোঙা ডাবে' যায় না। 'ভোঙা ডাবে' শুধু পুরুষরাই স্নান করে, 'সরু ডাবে' মেয়েরা আর ছোট ছোট ছেলেপিলেরা। মাঝখানে উঁচু বাঁধটা আড়ালের কাজ করে। এটা মেয়েদের খুব পছন্দ। কারণ এখানে পুরুষ-মেয়ে সবাই একবেলা খায়, উলঙ্গ হয়ে স্নান করে। আর সত্যিই, খালি গায়ে স্নান করতে যে মজা, সুইমিং কস্টিউম পরে সে মজা পাওয়া যায় না। আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে, যখন আমি নদীর জলে একটা ছোট্ট মাছের মতো সাঁতার কাটতাম। তিরতির করে সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে। আর এখন রবারের মাথা-ঢাকা আর নাইলনের প্যান্ট পরে মার্বেল পাথরের তৈরি সুইমিং পুলে যখন নামতে যাই, তখন মনে হয় যেন লৌকিকতা রক্ষা করতে কারোর সঙ্গে রেঁস্তোরায় ডিনার খেতে চলেছি।

চুনারের তলায় দাঁড়িয়ে উপত্যকার পথটি বেয়ে আমার নজর নদীর ধারে গিয়ে পড়তেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। কারণ বাঁধের দু'দিকে 'ভোঙা ভাবে' আর 'সরু ভাবে' লোকেরা নাইছে। দূর থেকে ছোট ছোট খেলনার মতো তাদের জলের ওপর সাঁতার কাটতে দেখা যাচ্ছে। সারা গায়ে ভীষণ জ্বালা ধরে গেলো আমার। দুপুর বেলা দারুণ গরম মনে হলো। হাওয়া বন্ধ। চারদিকে গুমোট ধরে আছে। নাইবার জন্যে এখুনি নদীর দিকে যাওয়া দরকার। আর সে কথা ভাবতেই আনন্দে আমার মুখ থেকে আবার চিৎকার বেরিয়ে এল। আমি ঢালু দিয়ে তারাদের বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লাম। আমার নদীতে স্নান করা নিষেধ। মা খুব কঠোরভাবেই এ ব্যাপারে সাবধান করে রেখেছেন। কিন্তু এখন তো মা শুয়ে রয়েছেন। চাকর-বাকররা ঢুলছে; বাগান নির্জন। তাছাড়া দূর থেকে নদীর কাকচক্ষু জল আমার কাছে ভারী চমৎকার মনে হলো।

তারাদের বাড়ি পৌঁছে ওর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারা কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে তারার মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'তারা বাড়িতে নেই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গেছে?'

'আমি কি জানি!' তেমনি কড়া গলায় জবাব এল।

এমন সময় আমার কথা শুনতে পেয়ে তারা কোথা থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়াল।

আমি বললাম, 'এই তো তারা রয়েছে!'

তারার মা ঝাঁজাল গলায় বলল, 'হ্যাঁ আছে, কিন্তু তোমার সঙ্গে খেলবে না।'

'কেন খেলবে না?'

'তোমার মা খারাপ মনে করে, তাই।'

'মা মনে করে, আমি তো করিনে। আমার সঙ্গে খেলতে পাঠিয়ে দাও ওকে।'

মা-র আঁচল টেনে ধরে তারা বলল, 'আমি যাব।'

তারার মা ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'না। যাবিনে।' তারপর ওকে টানতে টানতে দাওয়ার একপাশে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলো। তারা সেখানে পড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, এরা আমাদের খেলতে দেয় না কেন—আমার মা আর তারার মা দু'জনেই। সারা পৃথিবীর সব ছেলে-পিলেই তো একজন আরেক জনের সঙ্গে খেলে! তাহলে আমাদের দু'জনের জন্যে এ রকম নিষেধ কেন?

আমি তারার মাকে বললাম, 'আমি বাগানের ফল পাড়ব না, মৌমাছির চাকের দিকে যাব না। তত গাছের ডালে পায়রার বাসার ডিম দেখাতে নিয়ে যাব না তারাকে। আমরা শুধু 'সরু ভাব'-এর ধারে নাইব।'

কিন্তু তারার মা আবার মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'আমি কক্ষনো নদীতে নাইতে

যেতে দেবো না; না তারাকে, না তোমাকে। দেখো, সোজা বাড়ি চলে যাও বাছা। যদি নদীর দিকে গেছ, এক্ষুণি তোমার মাকে গিয়ে বলে দেবো।'

'অ্যা-অ্যা, বলে দেবো, বলে দেবো...' আমি মুখ বেঁকিয়ে তারার মাকে মুখ ভেংচালাম। সে আমায় দৌড়ে মারতে এল। অমনি আমি নীচে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড় দিলাম। অনেকক্ষণ সে আমার পেছনে ছুটে হাঁপিয়ে পড়ে গালাগাল করতে করতে বাড়ি ফিরে গেলো।

কিন্তু আমি দৌড়তেই থাকলাম। আমার চেয়ে বেশী বয়সের একজনকে মুখ ভেংচে দিতে পেরেছি, সে জন্যে খুব খুশি আমি। খুশিতে চিৎকার করতে করতে ঢালু বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। তারপর নদীর বাঁধের কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত পায়ে-হাঁটা পথ ধরে ক্রমাগত ছুটে চললাম।

প্রথমে 'ভোভা ভাবে'র দিকে গেলাম। সেখানে গাঁয়ের যুবকেরা সাঁতার কাটছে। তাদের মধ্যে সমদু রয়েছে। আমাদের তল্লাটে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ও। ওর ভাই ইউসুফও রয়েছে। আর আছে কানা হামিদা, মোটা মাখ্‌খি, সর্দার সিং স্যাকরা, সুন্দর ঘরাটিয়া। সুন্দর ঘরাটিয়া পানচাকি চালায়। আর এক হাতওয়ালা ভুল্লা —একটা হাতেই সে চমৎকার সাঁতার কাটে। আর রয়েছে কাশর বট। তার ভাই এক বিখ্যাত ডাকাত, জেল খাটছে। তাছাড়া রয়েছে দত্তা চামার, জালাল রাখাল, মংলু ব্রাহ্মণ, মুন্সির পণ্ডিত আর দু'তিন জন চাষীর ছেলে, আমি তাদের নাম জানিনে, অবশ্য মুখ-চেনা। সবাই নাইছে, হৈ-হল্লা করছে। কয়েক জন লাল রঙের একটা শুকনো লাউ নিয়ে ওয়াটার পোলোর মতো একটা খেলা খেলছে। আমায় দেখতে পেয়ে দু'জন খুশিতে চিৎকার করে উঠল।

সর্দার সিং স্যাকরা বলল, 'আরে ওই দেখ, ডাক্তারের হারামী বাচ্চাটা এসেছে।'

'ওকে তাড়িয়ে দে এখান থেকে। নইলে ওর মা খেয়ে ফেলবে আমাদের —যা রে, নিজের বাপের বাংলোয় চলে যা।'

কাশর বট বলল, 'না না, ওকে এখানে ডেকে এনে দু'চার ঘুঁষি লাগিয়ে দে।'

এক হাতওয়ালা ভুল্লা বলল, 'একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর মা ভাবেই না, কার সঙ্গে ও খেলবে!'

সমদু হেসে মন্তব্য করল, 'আরে না, ছোঁড়া বড় হয়ে খুব সৌখীন হবে, দেখিস। যখনই দেখ, জাঁহাবাজ চামারনীর মেয়ে তারার সঙ্গে খেলছে।'

সুন্দর ঘরাটিয়া জলে সাঁতার কাটতে কাটতে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তোর মা কোথায় রে?'

আমি সরল কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'ঘুমিয়ে আছে।'

'গিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।' এই বলে সুন্দর ঘরাটিয়া সাঁতার কাটতে কাটতে জল থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে তার নগ্ন শরীর দেখাল। সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

হঠাৎ কানা হামিদার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠল। আমার দিকে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'ভাগ এখান থেকে। যদি নাইতেই হয়, ও দিকের সরু ভাবে চলে যা, মেয়েদের দিকে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খিস্তি শুনতে মজা লাগছে, নাঃ!'

প্রায়ই ওদের গালিগালাজ শুনতে হয় আমায়। মারাত্মক ধরনের গালিগালাজ। ও সব শুনে শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, ছোট থেকেই আমার ওপর ঘেন্না রয়েছে ওদের। শুধু আমার ওপর নয়, যে সব অফিসাররা কিংবা রাজার তরফ থেকে যাঁরা ওদের ওপর প্রভুত্ব করেন, তাঁদের কাউকেই দেখতে পারে না ওরা। আমি এটাও জানি, বাপীর সঙ্গে আমায় কোথাও দেখতে পেলে ওরাই মাথা নীচু করে সালাম করে এবং আমাকে 'ছোট ডাক্তারবাবু' বলে কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু এই কাঁধে তুলে নেওয়াটা বাইরে দেখানো, মনের ভেতরে ঘৃণা সব সময়েই টগবগ করে ফুটছে। মা তো জানেনই না, সম্ভবত বাপীরও ধারণা নেই এ ব্যাপারে। কিন্তু আমার বয়েস অল্প হলেও লোকগুলো আমায় এটা বুঝিয়ে দিয়েছে। ওরা নিজেদের বউ কিংবা মেয়েদের প্রতি কখনও একটা খারাপ কথা ব্যবহার করে না, অথচ আমাদের মা কিংবা অন্যান্য মেয়েদের জন্যে একটিও ভদ্রকথা মুখে আসে না ওদের।

আমার দিকে জল ছিটনো দেখেই আমি সরু ভাবের দিকে পালিয়ে এলাম। তুঙ গাছতলায় তারার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। গর্বোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন এলি তুই?'

ও বলল, 'এই তো, তোমার পেছনে পেছনেই।'

'কি করে?'

'মা তোমায় মারার জন্যে যেই ঘরের বাইরে পা দিয়েছে, অমনি আমিও বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছি। সুমবুলের ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঢালু থেকে নেমে চলে এসেছি এখানে।'

'দেখেছ কেমন!' আমি হাফপ্যান্ট আর জামা খুলতে খুলতে বললাম, 'চল, আমরা নাইব।'

তারাও নিজের সালোয়ার-কামিজ খুলে ফেলল। আমরা দু'জন দিগম্বর দিগম্বরী হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে। তারাকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়েছি। আমি নিজেও বেশ ভালো সাঁতার জানি। তা সত্ত্বেও আমরা সাবধানে ধারে ধারে অগভীর জলে সাঁতার কাটতে লাগলাম। চমৎকার রঙচঙে পাথর জড়ো করে খেলতে শুরু করলাম। আমাদের পরস্পরের দেহের প্রতি কোনো লক্ষ্য ছিল না, কারণ ভাবে বেশী বয়েসের মেয়েরাও নাইছিল, সাঁতার কাটছিল। বলতে গেলে সব মেয়েই যুবতী। তাদের নগ্ন দেহ, স্তন, নাভিদেশ, উরু, জঙ্ঘা দেখে বড় অদ্ভুত মনে হলো। ওদের দেহ পুরুষদের কিংবা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মতো নয়। খুব আশ্চর্য ও মনোমুগ্ধকর শরীর ওদের।

তারা আমায় জানাল, 'ওই ফর্সা গোলগাল চেহারার মেয়েটা, ওর নাম শাদা। ও আমাদের তল্লাটের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। সমতুর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। আর ওই যে লম্বা লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, কালো রঙের মেয়েটা, ওর নাম নূরা। সমতুর ছোট ভাই ইউসুফকে ভালোবাসে ও। আর ওই যে মোটা মোটা দাঁত, খিলখিল করে হাসছে, ওর নাম গোলাপী। সুন্দর ঘরামিয়ার বউ। আর, ইয়া বড় নাই, মোটা মোটা ঠোঁট, ওর নাম রজি (রাজিয়া)।'

'মেয়েটা দেখতে ভারী বিচ্ছিরি।' আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো কথাটা।

'এই, আস্তে কথা বলো।' তারা সাবধান করে দিলো আমায়, 'ওদিকে বেশী নজর দিও না। নইলে আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, রজিটা দেখতে বিচ্ছিরি। ওর বিয়ে হচ্ছে না…'

'কেন বিয়ে হচ্ছে না?'

'মা বলে, ওর বিয়ে হবে না। দেখতে খুব খারাপ তো! তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে। এখনও কেউ ওকে বিয়ে করতেই চায়নি।'

আমি অহঙ্কার দেখিয়ে বললাম, 'তুইও তো দেখতে কত খারাপ, তাও তো আমি সব সময়েই তোকে বিয়ে করতে চাই!'

'তুমি তো একটা বুদ্ধু।' তারা আমাকে বোঝাতে লাগল, 'দেখতে খারাপ হলে সে মেয়ের বিয়ে হয় না —মা বলেছে। যে মেয়ে মা-বাবার কথা শোনে না, বড় হলে তার চেহারা না-কি বিচ্ছিরি হয়ে যায়।'

'মিথ্যে কথা!'

'না, সত্যি।'

'মিথ্যে।'

'সত্যি।'

তারাকে আমি দু' ঘুঁষি মারলাম। তবেই ও স্বীকার করল যে আমি যেটা বলছি, সেটাই সত্যি। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই মেয়ে দুটি কে?'

'কোন মেয়ে দুটি?'

'ওই যে বড় পাথরটায় বসে চুল শুকচ্ছে।'

সরু ভাবের মাঝখানে যে বড় বড় পাথরগুলো রয়েছে, তারই একটায় দুটি মেয়ে বসে বসে চুল শুকচ্ছে। তাদের অনাবৃত শরীরে জলবিন্দুগুলি শিশিরের মুক্তার মতো ঝকমক করছে।

'ওই পাতলা ছিপছিপে মেয়েটা হলো উম্মতুল, নম্বরদারের মেয়ে। কাশর বটকে বিয়ে করতে চায় ও। আর ওর সঙ্গে যে মেয়েটি চুলে আধখানা মুখ ঢেকে বসে আছে, পায়ের গোছা থেকে জল মুছছে, ও হলো কানা হামিদার বোন। সামনের ভাদ্দর মাসে হস্তা চামারের সঙ্গে ওর বিয়ে।'

'তুই জানলি কি করে?'

'মা আমায় বলছিল।'

'এ সব খবর তোর মা পায় কোথায় ?'

'ইস্, পাবে না কেন ? মা তো সব জানে। কার ঘরে কি রান্না হয়, মা সে খবরও রাখে।'

আমি সাঁতার কাটতে কাটতে একটা ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে একটা লাল পাথর তুলে আনলাম। পাথরটা দেখে তারা একেবারে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ওটা আমি নেব। ওটা আমি নেব।'

'দেবো না আমি।'

'আমি নেব।'

'দেবো না।' বলেই আমি জল থেকে উঠে পড়েছি। তারাও জল থেকে উঠে আমার পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল। তুত গাছটার তলায় আমরা পৌঁছেছি কি পৌঁছাইনি, এমন সময় মেয়েদের চিৎকার কানে এল আমাদের—

'কড এসেছে।'

'কড।'

'বাঁচাও বাঁচাও। কড এসেছে। কড! কড!!'

স্নানরতা মেয়েরা ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করছে।

হঠাৎ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম আমরা। দৃশ্যটা দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম একেবারে। নদীটার পাহাড়ের দিক থেকে হু-হু করে বন্যার জল প্রবল বেগে ঢুকছে সরু ভাবে। ডাবের জল তর-তর করে বাড়ছে। মেয়েগুলো সাঁতার-টাতার ভুলে গেছে একদম। ভয় পেয়ে নদীর এ পাড়ের দিকে না এসে মাঝখানের উঁচু উঁচু পাথরগুলোতে উঠে পড়ছে। সেগুলোতে জল পৌঁছায়নি তখনো। ওরা পাথরগুলোর ওপর উঠছে আর ভয়ে চিৎকার করছে, 'কড! কড!! বাঁচাও— বাঁচাও!!!'

কড অর্থাৎ প্লাবন নদীতে প্রায়ই হয়। কিন্তু সেটা সাধারণত বৃষ্টি-বাদলার দিনেই হয়। সারা আকাশ ঘনঘটায় অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে যখন। শীতকালেও কখনো কখনো বন্যা দেখা দেয়, যখন বরফ পড়ে, নদী-উপত্যকায় বৃষ্টি হয় কিংবা নদীর উৎসমুখে পাহাড়ে তুষারপাত হয়। তখন এ রকম প্লাবন চোখে পড়ে। কিন্তু এখন তো গ্রীষ্মকাল। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। দূর দূর পাহাড়ের শিখরদেশে কোথাও এক টুকরো সাদা মেঘও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ এই দুপুরবেলা সর্বনাশী কড এল কোথা থেকে ? ডাবের নীল জলে কড়ের গাঢ় ঘোলা জলের তীব্র স্রোত গর্জন করতে করতে কয়েক হাত ওপরে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

হয়তো এই পাহাড়গুলি থেকে দূরে, এখান থেকে চোখে পড়ে না, তেমনি দূরে কোথাও কোনো শৈলশিখরে মেঘ জমেছিল। সেই মেঘ থেকে হঠাৎ মুষলধারে

বৃষ্টি হয়েছে। তারপর সেই জলের প্রবল স্রোত শুকনো নালায় ঢুকে হাজার মণ ওজনের পাথরগুলোকে স্থানচ্যুত করে এই নদীতে এসে পড়েছে। এখন তা কণ্ডের আকারে হঠাৎ মৃত্যু ও ধ্বংসের দৈত্যের মতো গর্জন করতে করতে উঁচু উঁচু পাথর-গুলোর ওপর নগ্নদেহ মেয়েদের চারদিকে ঘুরছে।

আমি আর তারা দৌড়তে দৌড়তে নদীর ধারের ওই গাছটা থেকেও দূরে একটা উঁচু টিলার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে চোখ বড় বড় করে জলের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত দেখতে লাগলাম। এরই মধ্যে কণ্ডের জল সরু ভাব ছাপিয়ে নীচের খোলা ভাবে জলপ্রপাতের মতো পড়তে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নীচেও চেঁচামেচি শুরু হলো, 'কণ্ড এসেছে! কণ্ড!! কণ্ড!!!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই জল থেকে উঠে এল খালি গায়ে। উঠে আসতেই মেয়েদের চিৎকার কানে গেলো তাদের। অমনি তারা সরু ভাবের দিকে ছুটল।

সরু ভাবে তখন জলের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মাঝখানের উঁচু পাথরগুলোর মাথাটুকু জেগে আছে শুধু। সেখানে মেয়েরা পরস্পরকে জাপটে ধরে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'কণ্ড! কণ্ড! বাঁচাও! বাঁচাও!'

সবার আগে সমদুর চোখ পড়ল শাদার ওপর। চোখ পড়তেই সে এক মুহূর্তও দেরী না করে লাফিয়ে পড়ল জলে।

তারপর ইউসুফ ঝাঁপ দিলো।

ইউসুফের পর কানা হামিদা।

আর তারপর সুন্দর ঘরাটিয়া, দত্তা চামার, মুসির পণ্ডিত, কাশর বট —একে একে সবাই নেমে পড়ল জলে। শুধু এক হাতওয়ালা ডুমা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ তার একটা হাত নেই।

সবার আগে সমদু তার শাদাকে টেনে নিয়ে এল ধারে। তারপর ইউসুফ নূরাকে নিয়ে এল। সুন্দর ঘরাটিয়া তার স্ত্রী গোলাপীকে উদ্ধার করল। কাশর বট উম্মতুলকে কাঁধে করে তুলে আনল। কানা হামিদা ও দত্তা চামার দু'জনে মিলে হামিদার বোনকে তুলল। সবাই নিজের নিজের স্ত্রী, বোন, হবু-বউকে উদ্ধার করল। অবশেষে শুধু রজ্জি থেকে গেলো পাথরের ওপর। কারণ এখানে কেউ তার আত্মীয়-স্বজন নেই, তাকে ভালোবাসার কেউ নেই, কারোর প্রেমিকাও নয় সে সুতরাং কে বাঁচাবে তাকে?

জলের স্রোত ক্রমাগত বাড়ছে। পাথরগুলো এখন জলের তলায়। রজ্জি বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে পাথরটাকে। পায়ের দিকটা ডুবে গেছে তার। অসহায় চোখে পাড়ের দিকে সাহায্যের জন্তে চেয়ে দেখছে সে। কিন্তু সেখানে তার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ওরা এইমাত্র নিজেদের লোকজনদের উদ্ধার করে এনেছে। ক্লান্ত পশুর মতো হাঁপাচ্ছে ওরা। এখন তাদের চোখে লজ্জা ও নৈরাশ্য —জলের ঘূর্ণাবর্তে এখন মৃত্যুর আতঙ্ক।

হঠাৎ সমহু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু শাদা তার হাত চেপে ধরে বলল, 'কি করছ?'

কুৎসিত রজ্জি আশ্চর্য নীরব চোখে পাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। জল তাকে ক্রমশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ লাফিয়ে উঠে তার শরীরের ওপর আছড়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ রজ্জির মুখ থেকে এক আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে এল। সমহু শাদার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝপাৎ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। জলের স্রোত মারাত্মক, কিন্তু সমহুর যৌবনের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি। তাছাড়া জলের তো মস্তিষ্ক নেই। সমহুর রয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক। তাই বুদ্ধির জোরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমহু শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে এগিয়ে গেলো পাথরটার দিকে। আর একটু হলেই রজ্জি স্রোতে ভেসে যেত, এমন সময় সমহু তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। রজ্জিকে জড়িয়ে ধরে ডুবে-যাওয়া পাথরের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের লকলকে জিভ দেখতে লাগল।

এখন জলের স্রোত এ পাড়ের দিকে, যেখানে শাদা, নূরা, উমতুল, হামিদা, দন্তা চামার এবং অন্যান্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের প্রচণ্ড তোড় এখন সবটাই এ দিকে। অন্য দিকে মাঝখানের পাথরগুলো থেকে পাহাড়ের ধারটা কাছেই। সেখানে জলের বেগও কম। অবশ্য মৃত্যুভয় দু'দিকেই। তবু পাহাড়ের দিকে চেষ্টা করাটা কম বিপজ্জনক। সমহু ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে পুরুষ। চেষ্টা করা তার কাছে কর্তব্য।

শাদা দু'হাত বাড়িয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সমহুর দিকে তাকাল। হাত নাড়তো নাড়তে বলল, 'হায়, আমার সমহু।'

রজ্জির সারা দেহটা জলে দুলছিল। কিন্তু সে দু'হাতে সমহুর গলা জড়িয়ে ধরেছে। ওর পিঠে প্রায় লেগে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'ভয় নেই।' সমহু ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি তোমায় বাঁচাব। আল্লার ওপর ভরসা করো। সে যখন তোমার কাছ পর্যন্ত আমায় পৌঁছে দিয়েছে, তখন তোমায় পাড়ে নিয়ে গিয়ে তুলবই। ভয় পেয় না। আর আমার গলাটা অত জোরে চেপে ধরো না—সাঁতার কাটতে পারি যেন। নইলে দু'জনেই মারা পড়ব। বুঝলে?'

রজ্জি অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

ছলাৎ করে একটা ঢেউ আসতেই সমহু এ পাড়ের দিকে না এসে ও পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এ পাড় থেকে শাদা চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, ভেসে যাচ্ছে ও।'

কানা হামিদা বলল, 'না ওরা ও-পাড়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওদিকে জলের বেগটা কম মনে হচ্ছে।'

এটা জীবন-মৃত্যুর লড়াই। কিন্তু এই জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে সমত্তুর পুরোপুরি সাহায্য পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রঞ্জির ভয় দূর হয়ে গেলো। সমত্তুর সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের বিরুদ্ধে পুরোপুরি লড়াই করতে লাগল সে। দু-দু'বার তো ওরা ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু একবার সমত্তু এবং আর একবার রঞ্জি বুদ্ধির জোরে সামলে নিয়েছিল নিজেদের। হঠাৎ সমত্তুর মনে হলো, রঞ্জি খুব চমৎকার সাঁতার জানে।

'সাবাশ!' সমত্তু রঞ্জির সাহস বাড়াতে চাইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা নদীর অন্য পাড়ে পৌঁছে গেলো। পাড়টা নদীখাত থেকে অনেকটা উঁচু। পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। কয়েকটা বড় বড় গাছ রয়েছে সেখানে।

বিকেল পর্যন্ত কণ্ডের জল বাড়তেই থাকল।

তারপর সন্ধ্যে হলো। কিন্তু জল কমল না।

রাত্রি হলে এ পাড়ের সবাই নিরাশ হয়ে বাড়ি রওনা হলো। কিন্তু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কণ্ড সমত্তু ও রঞ্জির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা এখন দু'জনেই এক উঁচু ও নিরাপদ জায়গায় রয়েছে। আর কণ্ডের জল যদি রাতেও না কমে, তবে ওরা ও পারের কোনো পাহাড়ী গাঁয়ে রাতের মতো আশ্রয় নিতে পারবে। পরদিন সকালে কণ্ডের জল নেমে গেলে ফিরে আসবে ওরা।

পরদিন সকালে যখন কণ্ডের জল নেমে গেলো, তখন শাদা এ পাড়ে দাঁড়িয়ে সমত্তুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সমত্তু এল না, রঞ্জিও এল না। কয়েক মাস সমত্তু ও রঞ্জির খোঁজই পাওয়া গেলো না। হ্যাঁ, কয়েক মাস পরে সমত্তু ও রঞ্জি ফিরে এল যখন, তখন ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। রঞ্জি অন্তঃসত্ত্বা।

এই কণ্ডের ফলে তল্লাটের শুধু জমিগুলোতেই নয়, মানুষের মনেও নানা রকম ওলট-পালট ঘটে গেছে। সমত্তু রঞ্জিকে বিয়ে করাতে শাদা মনের ক্ষোভে ইউসুফকে বিয়ে করে বসেছে। ইউসুফ বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্যে নূরা মনের জ্বালায় কাশর বটকে বিয়ে করেছে। আর কাশর বটের বাগদত্তা, নম্বরদারের মেয়ে উম্মতুল দত্তা চামারের সঙ্গে পালিয়েছে। দত্তা চামারের হবু-বউ, কানা হামিদার বোন বাট বছরের বুড়ো নম্বরদারের গলায় মালা দিলো ···জলের সেই তরঙ্গ চারদিকের অবস্থা ওলট-পালট করে দিয়েছে। এখন তো এ ঘটনা আমাদের অঞ্চলে একটা গল্পের মতো। মাঝে মাঝে কোনো মহিলা যখন আমার মা-র কাছে এসে তার আইবুড়ি মেয়ের বিয়ে না-হওয়ার জন্যে দুঃখ করে, তখন আমার মা মুচকি হেসে বলেন, 'অত ভাবনার কি আছে! দেখ না, তোর মেয়ের জন্যে কোথা থেকে হুট করে একটা কণ্ড এসে পড়বে!'

চার

ঢালুর নীচে পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির নীচে এক মাইল লম্বা মাঠ। এখানকার ছেলেমেয়েদের ধারণা, এত বড় মাঠ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। মাঠের কাছে প্রায় একশো দোকান নিয়ে একটা বাজার। বাজারের পেছনে দু'দিকে এখানকার স্থায়ী গরিব বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি। বড়লোকদের বাড়িও রয়েছে। দু'তলা তিনতলা পাকা বাড়ি, পাথরের দেওয়ালের বাড়ি, টিনের চালের বাড়ি। বাড়িগুলোর মাঝে গলি-রাস্তা, রাস্তার মোড়ে নোংরা ছেলেপিলেদের হৈ-হল্লোড়। নাক টানতে টানতে তারা কাবাডি খেলে, নয়তো চোর-কাজী, কিংবা রাজা-চোর-ডাকাত। ঢালুর ওপরে সমতল জায়গায় অফিসারদের বাংলো। আর ঢালুর নীচে স্থায়ী বাসিন্দাদের বসবাস। বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া অফিসারদের ছেলেপিলে কিংবা তাদের বাড়ির লোকজন ওদিকে যায় না। ঠিক তেমনি স্থানীয় লোকজনদের ছেলেপিলে কিংবা মেয়েরা ওপরে খুব কম আসে। এ রকম কোনো আইনও নেই, লিখিত কোনো বিধি-নিষেধও নেই। তবু যেন এক অলিখিত বিধিনিষেধ এই দুই জগতের মধ্যে বাধ্যবাধকতায় দাঁড়িয়েছে। আমাদের জগৎ আলাদা, ওদের জগৎ আলাদা। এই দুটি জগতের মধ্যে এমনি এক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে অফিসারর' স্থানীয় বাসিন্দাদের যেমন বিশ্বাস করতে পারে না, তেমনি স্থানীয় বাসিন্দারাও অফিসারদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। জীবনের উত্থান-পতনে অবস্থার পার্থক্য ঘটতেই পারে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠবে কি করে! একজন হুকুম করে, অন্য জনকে হুকুম বরদাস্ত করতে হয়। পারস্পরিক এই সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা কি গড়ে উঠতে পারে?

ঢালুর ওপরের লোকেরা নীচের লোকদের অবজ্ঞা করে, তার অন্য কারণও রয়েছে। নীচের তল্লাটে দিনরাত মারপিট হয়, মাথা ফাটাফাটি হয়। রোজই দু'একটা কেস পুলিশের কাছে আসে। আহতদের হাসপাতালে আনা হয় চিকিৎসার জন্যে। স্থানীয় লোকদের এই ঝগড়া-ঝাঁটি নিয়ে অফিসাররা বড় বিব্রত। অবশ্য এটাও ঠিক, ঝগড়া-বিবাদের কল্যাণে এদের আধিপত্যও বাড়ে, ভাওতাও চলে। উঁচু-নীচুর মধ্যে ব্যবধান বজায় রাখাটা যেমন জরুরী, সেটা রক্ষা করাও তেমনি কম কঠিন কাজ নয়। এদের ধারণা, যারা ওপরতলার লোক, তাদের পক্ষেই শুধু এটা সম্ভব। কিন্তু এটাও সত্যি, যে, নীচের তল্লাটের লোকদের বাদ দিয়ে ওপরের লোকদের বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। আমাদের চাকর-বাকরেরা আসে ওখান থেকেই। আর্দালি, বাবুর্চি, মালী, ভৃত্য, মুরগীওয়ালা, ডিমওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, ধোপা,

নাপিত, মুচি, স্যাকরা, কামার, কুমোর —সবই ওদের লোক। এটা সত্যি, নীচের লোকেরা না থাকলে আমাদের বাড়ির উনুনও জ্বলত না। কিন্তু এটা এমন ভয়ঙ্কর বাস্তব যে, কেউ তা স্বীকার করতে রাজি নয়। আমরা এটা জানতাম। আমাদের বোঝানোও হতো যে, আমাদের জগতের অবস্থান অনেক উঁচুতে। এই উচ্চতার কত যে স্তম্ভ রয়েছে, সেই সত্যের সম্মুখীন হতে কেউ প্রস্তুত নয়।

শৈশবে এ ব্যাপারটা আমি এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করিনি। অনেক ব্যাপারেই আমার কাছে গোলমাল পাকিয়ে যেত। ওপরের লোকগুলো তাদের কথাবার্তায় এই গোলমাল পাকিয়ে দিত আরো বেশী করে। আমায় তো বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল যে, ঢালুর নীচের লোকদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলা উচিত নয়, ওদের থেকে দূরে থাকা উচিত। ওদের এলাকায় যাওয়াটাও ঠিক না। ওরা চোর, বদমাশ, গুণ্ডা, বেইমান —ঘৃণ্য জীব। ওরা বেঁচে থাকতে জানে না, সভ্যতার কোনো স্পর্শই পায়নি ওরা। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিসের?

একদিন সারা হাসপাতালটা আহত লোকজনে ভরে গেলো। পুলিশ পাহারায় দশ-বারোটি খাটিয়া বোঝাই করে তাদের হাসপাতালে আনা হয়েছে। শুনলাম, আরও দু'চারজনকে আনা হচ্ছে। ঢালুর নীচের বাসিন্দাদের মধ্যে মারাত্মক লড়াই হয়ে গেছে। পনেরো-বিশ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা খুবই গুরুতর।

বাপী হাসপাতাল থেকে শুধু এই খবরটা দিতে এসেছিলেন। মাকে বললেন, 'দেখো, আজ কাকাকে ওপরে পাঠিয় না। সারা হাসপাতাল জখমীতে ভরে গেছে। দু'জন হয়তো মারাই যাবে। ছোটদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভালো না।'

মা এ কথা শুনেই একটা রঙচঙে গল্পের বই নিয়ে আমার কাছে বসে গেলেন। আমায় দূর-দূরান্তরের রূপকথার পরীদের গল্প শোনাতে লাগলেন। কিন্তু আমার মন তো পড়ে আছে হাসপাতালে আহত লোকগুলোর মধ্যেই। কি রকম লড়াই হলো? কেন হলো? লড়াইবাজ লোকগুলো দেখতে কেমন? পনেরো-বিশ জন আহত লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই পঞ্চাশ-ষাট জন অন্য লোকও এসেছে! এমন কি, ঢালুর নীচের কিছু ছেলেপিলেও এসেছে হয়তো। ওপরে হাসপাতালে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা! আর এখানে এক পরী জাদুমন্ত্রে জোর করে এক রাজপুত্রকে ব্যাঙ করে দিয়েছে। কোন হ্যাবাগঙ্গারাম ব্যাঙ পছন্দ করে! মা আমার কাছ থেকে একটু সরে গেলেই এক ছুটে হাসপাতালে চলে যাব আমি। কিন্তু মিনিট পনেরো কেটে গেলো, মা একটুও নড়লেন না। গল্প দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। অমনি হঠাৎ আমার পেটব্যথা শুরু হয়ে গেলো। সোডামন্ট খেয়েও যখন পেটব্যথা কমল না, তখন মা কৃপারামকে বললেন, 'ওপরে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে পেটব্যথার ওষুধ নিয়ে আয়। কাকার পেটব্যথা করছে।'

'আমি নিজেই যাচ্ছি?' কোমল কণ্ঠে আবেদন করলাম আমি।

মা কড়া গলায় জবাব দিলেন, 'না।'

'পেটে শুধু ব্যথা হচ্ছে না, কি রকম একটা গোল মতো মনে হচ্ছে।'

মা বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, 'গোল মতো?'

'হ্যাঁ, আর গোলটার মধ্যে ঠিক যেন ঢোল বাজছে। চপ্-চপ্-চপ্...'

'গোলের মধ্যে ঢোলের শব্দ?' মা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আর গোলটার মধ্যে কি যেন একটা ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে, এখুনি পেট ফেটে যাবে।' আমি জোরে পেট চেপে ধরলাম।

মা খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'রুপা, তুই শিগ্গির কাকাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যা। গিয়েই দেখাবি। বলবি, সব কাজ ফেলে আগে কাকাকে দেখে ওষুধ দেন যেন।'

'আজ্ঞে, ঠিক আছে।' বলেই রুপা আমায় হাত ধরে নিয়ে চলল। আমার একটা হাত রুপার হাতে, অন্য হাতে পেট চেপে ধরে আছি আমি। যতক্ষণ পর্যন্ত বারান্দা থেকে দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ওইভাবেই হেঁটে গেলাম। বাংলোর সীমানার বাইরে আসতেই এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর সোজা হাসপাতালের পথ ধরলাম। যেতে যেতে রুপাকে বললাম, 'যদি মাকে কিছু না বলো, তাহলে একটা দু'আনি দেবো তোমায়।'

রুপার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একে তো ও ভীষণ লোভী তার ওপর আমার এই দু'নম্বরী কাজের দরুণ ও এক ঘন্টা পৌনে এক ঘণ্টার ছুটি পেয়ে গেলো। পাওনা-গণ্ডার দিক দিয়ে তো মন্দ নয়! আমার কথায় কেন রাজি হবে না ও?

আমি ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে পৌছে গেলাম। বারান্দায় তিল ধারণের জায়গা নেই। সারা বারান্দা জুড়ে আহতদের খাটিয়াগুলি পড়ে আছে। এমন কি, কিছু খাটিয়া বারান্দার বাইরে বাগানের মধ্যেও রয়েছে। বাগানের অন্যদিকে সার্জেন্ট কোরবান আলি পুরণমল শাহ ও অন্যান্যদের হাঙ্গামার পুরো ঘটনাটি বর্ণন করছেন।

আমিও ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম।

'...হ্যাঁ, বললাম তো। বলছি, ঝগড়া আজকের নয়, কালকেরও নয়। বহু দিনের পুরনো ঝগড়া। শুধু বুঝে নাও, এক তরফে চৌধুরী খুশিরামের বাড়ি, অন্য তরফে মুলাইয়ালদের সর্দার শাহবাজ খাঁর বাড়ি। মধ্যিখানের একটা জমি। দু' তরফই জমিটা দাবি করে আসছে।'

কহর সিং জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু জমিটা আসলে কার?'

'সেটা নিয়েই তো ঝগড়া। বললাম তো। আমি কি বলছি শোনো না! জমিটা নিয়েই ঝগড়া। তহসিলদার কিছু বলেছে। আশপাশের লোকেরাও কিছু বলেছে। পাটোয়ারীর কাছ থেকেও কিছু শুনেছি। যে বেশী ঘুষ দেয়, জমিটা

তারই হয়ে যায়। মোট কথা, জমি কখনো শাহবাজ খাঁর হাতে আসে, কখনো খুশিরামের হাতে, কিন্তু কারোর নামেই রেকর্ড হয়নি আজ পর্যন্ত।'

'কারোর নামে এখনও রেকর্ড হয়নি কেন?'

'রেকর্ড হলে তো সমস্ত ঝগড়া মিটেই যেত। সেটাই তো বললাম। আমি কি বলছি শোনো না।' কোরবান আলি একজন বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এক তরফ মুলাইয়ালদের লড়াইবাজ সর্দার শাহবাজ খাঁ, অন্য তরফ মুহিয়া ব্রাহ্মণদের মুখিয়া চৌধুরী খুশিরাম—এক নম্বরের লাঠিবাজ। দুই বড়লোক শক্তির অহংকারে ফুলছে। মুসলমানদের ওপরে একজনের বেশ প্রভাব রয়েছে, অন্য জনের হাতে আছে সরকারী আমলারা।'

পুরণমল শাহ জিজ্ঞেস করল, 'সেটা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু মাঝখানে এই মালিক আতামহম্মদ কি করে এসে পড়ল? ঝগড়াটা তো চৌধুরী খুশিরাম আর শাহবাজ খাঁর মধ্যে। এর মাঝে মালিক আতামহম্মদ জড়িয়ে গেলো কি করে?'

'আরে, সেই কথাই তো বলছি, শোনো না।' কোরবান আলি খুব আমেজ করে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'একদিন রাত্রে চৌধুরী খুশিরাম ঠাকুরের নাম নিয়ে বাড়ি তুলতে শুরু করে দিলো, যে জমি নিয়ে ঝগড়া, সেই জমিতেই। রাতের মধ্যেই দেওয়ালগুলো তুলে ফেলল সে। পরদিন শাহবাজ খাঁ আল্লার নাম নিয়ে দেওয়ালগুলো ভেঙে দিলো। সেদিন রাত্রে চৌধুরী খুশিরাম আবার দেওয়াল তুলল, পরদিন শাহবাজ খাঁ আবার ভেঙে ফেলল—বারো দিন ধরে এই চলতে থাকল। শেষে চৌধুরী খুশিরামের বড় ছেলে হাবিলদার আত্মারাম ভীষণ রেগে গেলো। এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এল। একটা কুড়ুল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, শাহবাজ খাঁর মোকাবিলা করার জন্যে হাঁক পাড়তে লাগল। ওদিকে শাহবাজ খাঁও মুলাইয়াল সর্দারের সর্দার। এক যুগ থেকে ও তল্লাটে মাতব্বরি করছে। ওর মাথাতেও খুন চাপল। নিজের লোকজন নিয়ে বেরিয়ে এল সে। আর তোমরা তো জানো, মুহিয়াল ব্রাহ্মণরাও কম লড়াইবাজ নয়। নিজেদের ওরা পরশুরামের বংশধর বলে। ইংরেজ পল্টনে যোগ দিয়ে খুব নাম কিনেছে। হাঁক পেড়ে ওরা চৌধুরী খুশিরামের পাড়ায় এসে হাজির হলো। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল আর কি! এমন সময় মাঝখানে মালিক আতামহম্মদ লাফিয়ে পড়ল।'

পুরণমল শাহ আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু মালিক আতামহম্মদের কি স্বার্থ ছিল তাতে?'

'সেটাই তো বলছি, শোনো না। মালিক আতামহম্মদ তার দুই ছেলে খান মহম্মদ ও গোলাম মহম্মদ আর নিজের অন্যান্য লোকজন নিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়াল! সে চৌধুরী খুশিরামকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'চৌধুরী, তুমি এর মধ্যে থাকবে না। এ লড়াই আমার।' এই বলে সে চৌধুরী খুশিরামকে দূরে সরিয়ে

দিলো। তারপর শাহ্‌বাজ খাঁকে হাঁক দিয়ে বলল, 'এই জমিতেই খুশিরামের বাড়ি তৈরি হবে। লুকিয়ে নয়, দিনের আলোতেই বাড়ি তুলবে চৌধুরী। যদি তোর মোকাবিলা করার হিম্মত থাকে, গোঁফ খাড়া করে সামনে এগিয়ে আয়।' এর পর আর লড়াই না বেধে পারে! এ কথা শুনেই শাহ্‌বাজ খাঁ আতামহম্মদের ওপর ছুরি চালাল। তারপর আরম্ভ হয়ে গেলো দু'দলে মারপিঠ, ধস্তাধস্তি।'

ফতু কামার জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ কোথায় ছিল?'

সার্জেন্ট কোরবান আলি ক্রুদ্ধ চোখে ফতেহ্‌দীন কামারের দিকে তাকালেন। রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'সেই কথাই তো বলছি, শোনো না। আমি লালু গড়ে গেছি এক ফেরারী আসামী ধরতে। দারোগা সাহেব দু'জন সেপাই সঙ্গে নিয়ে বড় চকে গেছেন তদন্ত করতে। হাবিলদার নিয়াজ মহম্মদের পেটে ব্যথা। চারজন সেপাই ছুটিতে। আমি তো ফিরে এসেই কেসটা হাতে তুলে নিয়েছি। আর এখন, তদন্তের কাজ ছেড়ে দারোগা সাহেবও ফিরে এসেছেন।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন না মালিক আতামহম্মদ এতে জড়িয়ে পড়ল কেন?'

'মালিক আতামহম্মদ ও তার বড় ছেলে খান মহম্মদ এমন জখম হয়েছে যে ওদের বাঁচার কোনো আশা নেই। এইমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভেতরে গেলেন। দারোগা সাহেব তো ডাক্তারবাবুর কাছে দাঁড়িয়েই রয়েছেন। মনে হয় আতা-মহম্মদের জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছে। সেটা হলেই বোঝা যাবে ও এতে জড়িয়ে পড়ল কেন —মাথায় টেরি কেটে খামোকা নিজের জীবনটাই বাজি ধরতে গিয়েছিল কেন?' —বলতে বলতে সিগারেটে টান দিলেন কোরবান আলি। ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে লাগলেন। আমিও পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম।

হাসপাতালের বারান্দায় খুব ভীড়। কিন্তু সার্জেন্টকে দেখেই রাস্তা ছেড়ে দিলো তারা। আমিও কোরবান আলির সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে চলে গেলাম। যদিও দরজায় পর্দা ঝুলছিল, কিন্তু সবাই আমায় চিনত বলে কেউ নিষেধ করল না। কোরবান আলি অপারেশন রুমের ভেতরে গেলেন। তাঁর পেছনেই দাঁড়ালাম আমি। সে জন্যে কেউ দেখতে পেল না আমায়।

কোরবান আলির দীর্ঘ পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, খাটের ওপর খান মহম্মদের লাশ পড়ে আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। অন্য একটা খাটে আতা-মহম্মদ মারাত্মক আহত অবস্থায়। ম্যাজিস্ট্রেট তার জবানবন্দী নিচ্ছেন। পাশে একটা চেয়ারে ডাক্তারবাবু বসে আছেন, অন্য একটায় দারোগা সাহেব। ওঁদের পেছনে চৌধুরী খুশিরাম মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী বেঁধে দাঁড়িয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট লাল খান জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আতামহম্মদ, অন্যের ঝগড়ায় তুমি মাথা গলাতে গেলে কেন? শাহ্‌বাজ খাঁ আর চৌধুরী খুশিরামের মধ্যে জমি নিয়ে ঝগড়া। এর মধ্যে তুমি এসে পড়লে কি করে?'

মালিক আতামহম্মদ শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকটি কথা একটি একটি করে উচ্চারণ করতে লাগল, 'হুজুরের নিশ্চয়ই ১৯১৫ সালের প্লেগের কথা মনে আছে। হুজুর অবশ্য তখন আসেননি এখানে। কিন্তু তখনকার লোক যারা এখানে হাজির রয়েছে, তারা জানে সবাই। আমাদের তল্লাটে ওর চেয়ে বড় মড়ক আর কখনও হয়নি। রোজ ডজনে ডজনে, কখনো শত শত লোক মরছিল। সরকারী গরুর গাড়ি আসত, লাশ বোঝাই করে নিয়ে চলে যেত। সব লোক এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করল। মা ছেলের দিকে তাকাল না, ছেলে মায়ের দিকে। পালানোর জন্যে ছুটোপাটি শুরু হয়ে গেলো। আমার বয়েস তখন বড় জোর বিশ বছর। বাড়ির মধ্যে সবার আগে আমারই প্লেগ হলো। আমার প্লেগ হয়েছে দেখেই সবাই বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। আমি তখন জ্বরে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছিলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা জিজ্ঞেসও করল না—আমার কাছেও এল না। 'হায় হায়' করতে করতে প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল সবাই। মা, বাবা, ভাই, বোন—সবাই। চোখের পলকে বাড়িটা শূন্য হয়ে গেলো। আমি তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বললাম, 'আরে, কোথায় পালাচ্ছ তোমরা? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।' কিন্তু ওরা আমায় পেছনে আসতে দেখে এমন করে ছুটে পালাল, যেন আমি মানুষ নই, ভূত। আমি দরজার বাইরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর আমার আর মনে নেই, কি হয়েছিল, কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই সরকারী গরুর গাড়িতে তোলা হয়েছিল। এমন সময় চৌধুরী খুশিরামের বাবা চৌধুরী সীতারাম কোথা থেকে এসে পড়লেন। আমার পা নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, তখনো আমার প্রাণ রয়েছে। তিনি গরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন আমায়। কাঁধে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দিনরাত সেবা-শুশ্রূষা করে আর ওষুধপত্তর দিয়ে সারিয়ে তুললেন আমায়। তারপর প্লেগ দূর হলো। লোকজন ফিরে আসতে লাগল। আমাদের বাড়িও লোকজনে ভরে উঠল আবার। আমার বিয়ে হলো, ছেলেপিলেও হলো। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মান-মর্যাদাও আমার কপালে জুটেছে। কিন্তু হুজুর, আমার প্রাণ দিয়েছে তো চৌধুরী সীতারাম। সেই প্রাণ আজ তাঁরই বংশধরদের কাজে লেগেছে। সে জন্যে আমি খুব খুশি।'

অনেকক্ষণ কথা বলে মালিক আতামহম্মদ চুপ করলেন। তার চেহারা একেবারে হলদে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। থেমে থেমে তার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। তারপর বড় কষ্টে সে চোখ মেলে তাকিয়ে, চৌধুরী খুশিরামকে ইশারা করে কাছে ডাকল। নিজের হাত তার হাতে রেখে বলল, 'চৌধুরী খুশিরাম, সেই প্লেগের আমল থেকে আমাদের বংশের একটি প্রাণের ঋণ চলে আসছিল তোমাদের বংশের কাছে। আজ আমি সেই ঋণ শোধ করলাম। শুধু তাই নয়, উপরন্তু আরও একটা প্রাণের ঋণ চাপিয়ে দিলাম তোমাদের ওপর। ঠিক তো?'

চৌধুরী খুশিরাম চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল আতামহম্মদ। তারপর আস্তে আস্তে চৌধুরীর হাত থেকে নিজের হাতখানা টেনে নিল বুকের ওপর। চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। অস্ফুট স্বরে বলল, 'ছেলের কবরের কাছেই আমার কবর দিও।'

তারপর তার ঘড়ঘড়ে গলা থেকে 'আল্লা আল্লা' শব্দ বেরোতে লাগল। এক সময় সে আওয়াজও ক্ষীণ হয়ে এল। হঠাৎ একটা হেঁচকি উঠল। ডাক্তারবাবু নাড়ী ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'শেষ।'

ম্যাজিস্ট্রেট লাল খান তার কথাগুলো লিখে নিতে নিতে হঠাৎ কলম ছেড়ে দিলেন। তাঁরও চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। ডাক্তারবাবু ও দারোগা সাহেবের চোখ থেকেও জল পড়ছিল। চৌধুরী খুশিরাম আতামহম্মদের লাশটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের কপাল চাপড়ে কাঁদছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট লাল খান চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। নিজের হাতে মালিক আতা-মহম্মদের লাশ পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। তারপর বাপীর সঙ্গে জোরে করমর্দন করতে করতে বললেন, 'এই ঢালুর নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যেও কত মহৎ লোক আছে!'

তারপর সেই অপারেশন-রুমেই বহু লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতেহা (কোরান শরীফের অংশবিশেষ) পাঠ করতে শুরু করল।

পাঁচ

মা-র মূত্রাশয়ের ব্যথায় অসুখ আছে। বছরে দু'তিনবার ব্যথাটা ওঠে। এমনিতে মোটামুটি মামুলী ব্যথা, কিন্তু কখনো কখনো ব্যথাটা এমন বাড়ে যে পাঁচ-ছ'দিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন তিনি। তাঁর চিৎকার শুনে আমি পায়ের কাছে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। বাপীর ওষুধপত্তরে দু'তিন দিনেই ব্যথার তীব্রতা কমে আসে, কিন্তু তার পরেও তিনি তিন-চার দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। আর তখন অবধি স্বাধীনতা পেয়ে আমার দিনগুলো বেশ কাটে। বলা উচিত নয়, তবু সেটাই বাস্তব। মা-র ব্যথাটা যখন কমে আসে, তখন আমার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা এ বার সেরে উঠছেন, শুধু এই ভেবে নয়, সেই সঙ্গে আরও একটা আশা জাগে, মা এখনো তিন-চার দিন বিছানায় শুয়ে থাকবেন। এ ক'দিন স্বাধীনভাবে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে খেলতে পারব আর বাগানের বাইরেও যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারব। আমায় নিষেধ করার কেউ থাকবে না। বড়রা ভাবতেই পারে না ছোটদের জগতে স্বাধীনতা কত কম, আর সেই সীমাবদ্ধতা তাকে কত উত্যক্ত করে! একটি বাড়ি, একটি বারান্দা, বাগান আর দু'একটা ঢালু জায়গা —ব্যস্। কোথাও বা একটি গলি, একটা ছোট্ট মাঠ কিংবা ঘরের শুধু চারটি দেওয়াল। কখনো কখনো বাজারের একটা মোড়। শৈশবের কয়েক বছর এই ছোট্ট সীমাবদ্ধ জগৎটাই চোখে পড়ে।

গত দেড় মাস ধরে আমার ওপর কঠিন পাহারা চলছে। তারার সঙ্গে জঙ্গলের ঢালুতে গিয়ে বুনো আখ খেয়ে এসেছিলাম। তার ফলে পেটে খুব ব্যথা হয়েছিল —বড় ভুগতে হয়েছে। সেদিন থেকে মা কঠোরভাবে তারার সঙ্গে খেলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমি আর তারা দু'জনেই তাঁর হাতে মার খেয়েছিলাম। অন্য সময়েও মার খেয়েছি, কিন্তু আমার ওপর এমন কঠিন পাহারা আর কখনও শুরু হয়নি। একজন ভৃত্য সব সময় আমার চারদিক ঘিরে থাকে। দূরে কোথাও তারাকে দেখতে পেলেই সে শক্ত করে হাতের মুঠি পাকায়। বেচারী তারা মারের ভয়ে তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে দৌড় দেয়। একবার আমি একজন ভৃত্যকে পাঁচটি নাশপাতি ও এক আনা ঘুষ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাজিটা ঘুষ নিতে চায়নি! অন্য একজন ভৃত্য হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে দু'আনা ঘুষ নিয়েছিল, কিন্তু তারপরও সে তারাকে ধমক দিয়ে তাগিয়ে দিয়েছিল।

সে জন্যে এ বার যখন মা-র ব্যথাটা উঠল, তখন আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে ঠাকুর, মা যেন সেরে ওঠেন, তবে দু'তিন দিনের বদলে অন্তত পাঁচ-ছ'দিন

বিছানায় শুয়ে আরাম করুন তিনি। আমার শয়তানের মন সেটাই চেয়েছিল।
এখন বড় হয়ে ভাবি, সেই আগুন, যা মানুষকে নদীর বুকে সেতু নির্মাণে, সমুদ্রে জাহাজ চালাতে, নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করে; লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগায় মনে, সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই আগুন, সেই উন্মাদনা, আবেগ, উদ্যম, সর্বাগ্রে শিশুর মনেই স্ফুলিঙ্গের মতো দেখা দেয়। নির্যাতনের ফলে যদি স্ফুলিঙ্গ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠার উপযুক্ত সুযোগ না পায়, শৈশবেই তা নিভে যায়। আপনি নিশ্চয়ই এ রকম লক্ষ লক্ষ অলস অকর্মণ্য ব্যক্তিকে দেখেছেন, যাদের জীবন এক-একটি নির্বাপিত প্রদীপের মতো, জীবনের অন্ধকার দুরূহ যাত্রাপথে এরা হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হয়। এ সব লোকের দুর্ভাগ্যের মূলে তাদের অবস্থা ছাড়াও তাদের মা-বাবারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে জন্যে আমি বাপীর মতোই দুরন্ত শিশুদের বড় ভালোবাসি, কারণ আমি তাদের মধ্যে সেই স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই।

প্রথম দু'দিন মা-র মূত্রাশয়ের ব্যথাটা মামুলী ধরনেরই ছিল, সে জন্যে তাঁর কাতরানিটাও ছিল মামুলী রকমের। আমার ওপর পাহারাদারীটা ঠিকই চলছিল, আমাকে চোখে চোখেই রাখছিলেন তিনি। কিন্তু তৃতীয় দিনে তাঁর ব্যথাটা এমন তীব্র হয়ে উঠল যে আমিও কেঁদে ফেললাম। বাপী সে সময় হাসপাতালে ছিলেন। একজন ভৃত্য দৌড়তে দৌড়তে গেলো বাপীকে খবর দিতে। খবর পেয়েই তিনি ছুটে এলেন। মাকে ইঞ্জেকশন দিলেন একটা। তাতে মা-র ব্যথাটা শুধু কমে গেলো তাই নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি ঘুমিয়েও পড়লেন। বাপী আমায় এবং অন্যান্যদের বললেন যে, মা এখন কয়েক ঘণ্টা বেশ আরামে ঘুমোবেন, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। যতক্ষণ ঘুমোতে চান, ঘুমোবেন, কেউ যেন তাঁকে ঘুম থেকে ওঠানোর চেষ্টা না করে। কথাটা বলে বাপী দুষ্টু চোখে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। আমিও তাঁর এই অনুমতির অপেক্ষা করছিলাম। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই আমি চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং তারার খোঁজে গেলাম।

তারাকে দেখতে পেলাম তাদের বাড়ির নীচেই ঢালুতে। লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস কাটছে সে। আমার দিকে পেছন ফিরে আছে। পা টিপে টিপে আমি তার কাছে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে তার নিপুণ হাতে কাস্তে চালানো দেখলাম। এতটুকু এক ছোট্ট মেয়ে এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে শিখে নেয় কি করে! এই বয়েসে আমরা তো একটা কাস্তে কেন, একটা চামচও ঠিকভাবে ধরতে পারিনে! ওর সঙ্গে খেলতে খুব ইচ্ছে করছিল। এগিয়ে গিয়ে ঝট করে দু'হাতে ওর চোখে চেপে ধরলাম।

ও জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

আমি চুপ।

ও বলল, 'হু, বুঝেছি। বাবু, তিঙ্গির ছেলে খোকা।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলাম। রেগে গিয়ে বললাম, 'নিজে চাষারণী তো, সে জন্যে অন্যকেও তিঙ্গি বলবে না তো কি!'

তারা জোরে হেসে উঠল। প্রথমেই সে বুঝতে পেরেছিল ঠিক, শুধু আমায় রাগাতে চাইছিল বলে…

'চল, খেলি।'

'না।'

'না কেন?'

'তোমায় মা মারবে।'

'না, মারবে না। মা-র অসুখ, বিছানায় শুয়ে আছে।'

এক মুহূর্তের জন্যে তারার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ দপ করে নিভে গেলো যেন। বেজার মুখে বলল, 'তাছাড়া আমি খেলতে যাব কি করে?'

'কেন?'

'মা বলে গেছে, বিষ্টু বামুনের বাড়িতে এক বোঝা ঘাস দিয়ে আসতে হবে। মা নিজে তো দত্তাদের ক্ষেতে কাজ করতে গেছে। আমাকে ঘাস কাটতে বলে গেছে।'

'কতক্ষন ঘাস কাটবি?'

'যতক্ষণ এক বোঝা না হয়।'

'বোঝা কখন হবে?'

'সন্ধ্যে নাগাদ।'

রাগে পা আছড়ালাম আমি। তবে কি ওর উদ্দেশ্য, সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা খেলব না! আর সন্ধ্যের আগে আমি যদি বাড়ি না ফিরি, চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। ওর উদ্দেশ্যটা কি, আজ আমাদের খেলাই হবে না!

তারা খুব চিন্তিত হয়ে চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

আমি ওর হাত থেকে কাস্তেটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, 'ওঠ। খেলতে চল।'

ও অসহায় কণ্ঠে বলল, 'না। মা মারবে।'

'ভারি বিপদ তো! কখনো আমার মা মারবে, কখনো তোর মা মারবে। আচ্ছা, মারা ছাড়া ওরা কি আর কিছু জানে না!'

তারা চুপচাপ কাস্তে তুলে নিয়ে আবার ঘাস কাটতে শুরু করল।

হঠাৎ আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আচ্ছা, একটা উপায় বলব?'

তারা নিরাশ গলায় বলল, 'তোমার সব বুদ্ধি পিটুনী খাওয়ার। বলতে হবে না তোমায়।'

'আগে শুনে নে।' আমি উপায়টার কথা ভেবে আরও খুশি হয়ে বললাম, 'আমরা এক্ষুনি গিয়ে বিষ্টু বামুনের গরুটা খুলে নিয়ে আসব। এই ঢালুতে চরবার জন্যে ছেড়ে দেবো ওকে। গরুটার ঘাস খাওয়া দরকার। ঘাস তো রয়েছেই এখানে। ঘাস কেটে গরুটার কাছে নিয়ে যাওয়ার বদলে গরুটাকেই ঘাসের কাছে নিয়ে আসি না কেন! ব্যস্, আর কি চাই?'

'বাঃ, চমৎকার!' তারা একটু ভেবে-চিন্তে দেখে নিয়ে আনন্দে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার সঙ্গে সে খুশিতে নাচতে লাগল। তারপর সে কাস্তেটা তাদের বাড়ির পেছন দিকের চালে লাউয়ের লতার মধ্যে লুকিয়ে রাখল। আমরা একসঙ্গে বিষ্টু বামুনের চালাঘরের দিকে দৌড় দিলাম, যেখানে গরুটা বাঁধা থাকে। কিন্তু চালাঘরে ঢুকে হতাশ হতে হলো আমাদের। গরুটা নেই সেখানে। বাইরেও খুঁজলাম আমরা। কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে আমরা ফুলওয়ালা ঝর্ণাটার কাছে এসে পৌঁছালাম। এই ঝর্ণার ধারে এবং ওপরের টিলায় শীতকাল ছাড়া প্রতিটি ঋতুতে ফুল ফোটে, সে জন্যে এটাকে ফুলওয়ালা ঝর্ণা বলে। যে-টিলা থেকে ঝর্ণাটা বেরিয়েছে, সেই টিলার ওপর কাও গাছে আঙুরলতা। কালচে লাল রঙের আঙুর ধরে তাতে। কাও গাছের মধ্যিখানে একটা মৌচাক। আঙুরলতার বড় বড় সবুজ পাতার ঝোপে মৌমাছিদের গুঞ্জন শুনে মনে হয়, আঙুরলতার ঝোপের মধ্যে আরও একটি ফুলওয়ালা ঝর্ণা ঝিরঝির করছে। এখানে এক আশ্চর্য নীরবতা, স্তব্ধতা। ছোট ছোট নীল পাথরের আশপাশে ধূসর ডানাওয়ালা জল-প্রজাপতি জলের ওপর সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ব্যাঙ জলের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, আমাদের দেখেই লাফ দিয়ে জলে পড়ল। ঝর্ণার জলে আঙুরের কয়েকটি সবুজ পাতা ভাসছে। পাতাগুলোর ওপর জলবিন্দু টলটল করছে, ঠিক যেন হাতের চেটোয় ঝকঝক করছে মুক্তো।

তারা ঝর্ণার ধার থেকে কিছু ফুল তুলল। ফুলগুলো একটা গোছা করে চুলে গুঁজে নিল সে। তারপর আমায় বলল, 'এগুলো প্রজাপতি ফুল।'

আমি বললাম, 'না, এগুলো পনেরী। বাবা বলেছেন আমায়।'

'উঁহু, এগুলো প্রজাপতি ফুল।'

গাঢ় কালচে লাল রঙের মসৃণ পাপড়ি ফুলগুলোর। মধ্যিখানে হলদে ছোপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় সবুজ পাতার ওপর সত্যিই যেন কালচে লাল রঙের চমৎকার প্রজাপতি বসে আছে।

আমি বললাম, 'এই ফুলের একটা গল্প আছে।'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'কি গল্প?'

আমি গরজ দেখিয়ে বললাম, 'বলব না।'

'বলবে না!' তারা আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলো।

'না।'

'তবু না ?' তারা আমার পিঠে আর একটা কিল বসাল। অবশ্য পুরোপুরি গায়ের জোর দিয়ে নয়। আমি কিল খেয়ে হাসতে লাগলাম।

তারা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলে শোনাবে ?'

'আমার একটা শর্ত আছে।'

'কি ?'

'তুই বনফ্‌শা ফুলের মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দে, আমি তোকে পনেরী ফুলের গল্প শোনাব।'

'আচ্ছা!' বলে তারা নিতান্ত অনুৎসাহে উঠে গেলো। কারণ বনফ্‌শার ছোট ছোট ফুলে মালা গাঁথা বেশ কঠিন, অনেক সময়ও লাগে।

তারা টিলার ওপর থেকে ঘাসের একটা লম্বা শিষ তুলে নিল। সাফ-সুতরো করতেই সেটা দেখতে একটা তাগার মতো হলো। তারপর বনফ্‌শার ফুল তুলে এনে শিষটায় গাঁথতে বসল। ফুল গাঁথা হলে শিষের দু' মাথা জোড় করে একটা গিঁট দিয়ে নেবে, তাহলেই মালা তৈরি হয়ে যাবে।

শিষে বনফ্‌শার ফুল গাঁথতে গাঁথতে তারা বলল, 'নাও, এ বার গল্প বলো।'

আমি শুরু করলাম, 'একটি ছেলে ছিল।'

'তোমার মতো ?'

'হ্যা, আমার মতো।'

'তারপর··· ?'

'আর একটি মেয়ে ছিল।'

'আমার মতো ?'

'উঁহু, তোর চেয়ে ভালো।'

'ধ্যেৎ!' তারা রেগে ফুলগুলো মাটিতে ফেলে দিলো।

'আচ্ছা আচ্ছা, মেয়েটা ঠিক তোর মতো। কিন্তু ওরা দুই ভাই-বোন। প্রজাপতি ধরার খুব শখ ওদের। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো বড় বড় ডানার প্রজাপতি ধরে, জলের ওপর সাঁতার কেটে বেড়ানো ছোট ছোট ডানাওয়ালা প্রজাপতি ধরে। তারপর ওদের মেরে ফেলে ব্লটিং পেপারে শুকিয়ে নিজেদের অ্যালবামে সাজিয়ে রাখে।'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'ব্লটিং পেপার কি জিনিস ?'

'এক রকমের কাগজ। থসথসে মোটা। কালি শুষে নেয়। জলে রাখলে জল টেনে নেয়। আমার অনেক ব্লটিং পেপার আছে, তোকে দেখাব।'

'আমার একটা দিতে হবে!'

'আচ্ছা, দেবো না হয়।'

'বেশ, তারপরে বলো, কি হলো ?'

'তারপর হলো কি, ওদের দুই ভাই-বোনকেই ওদের বাবা-মা প্রজাপতি মারতে

খুব নিষেধ করত। কিন্তু ওরা আমাদের মতোই শয়তান ছিল তো, কোনো কথাতেই কান দিত না।'

'আমি শয়তান নই। শয়তান তুমি।'

'না, তুই।'

'আমায় শয়তান বলবে তো মালা ছিঁড়ে ফেলে দেবো।' তারা ধমক দিলো আমায়। আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি গল্পের পরবর্তী অংশ বলতে লাগলাম।

'একদিন হলো কি, ওদের বাগানে দুটি চমৎকার প্রজাপতি এল। একটার ডানায় বাসন্তী লাল আর কালচে লাল রঙ। অন্যটার ডানায় নীল, সবুজ আর গোলাপী রঙের ছোপ। এমন সুন্দর প্রজাপতি ওদের বাগানে এর আগে কখনও আসেনি। দুই ভাই-বোন ও দুটোকে ধরার জন্যে ছুটল। প্রজাপতি দুটো ফুলে ফুলে উড়তে উড়তে বাগানের বাইরে চলে গেলো। ওরা দু'জন প্রজাপতির পেছনে পেছনে বাগানের বাইরের ঢাল, ঢাল থেকে নদা, নদী পেরিয়ে এক পাহাড়ের কাছে এসে পৌছাল। পাহাড়ে চড়ল ওরা। পাহাড়ের ওপর জঙ্গল, খুব ঘন —ভীষণ ঘন। আর তেমনি ভয়ঙ্কর।'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'আর সেখানে একটা বাঘ ছিল ?'

'গল্প তুই বল ছস, না আমি ?'

'আচ্ছা আচ্ছা, তারপর বলো।'

'সেই জঙ্গলে গিয়ে একটা প্রজাপতি একদিকে উড়ে গেলো, অন্যটা আর এক-দিকে। দুই ভাইবোনও আলাদা হয়ে গেলো। ভাই বাসন্তী লাল আর কালচে লাল ডানাওয়ালা প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটল, বোন গেলো নীল, সবুজ আর গোলাপী ডানাওয়ালা প্রজাপতির পেছনে। জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে, গভীর হচ্ছে, অন্ধকার হচ্ছে। দিনের বেলাও রাত্তির বলে মনে হয়। শেষে ভাই খুশিতে চিৎকার করে উঠে প্রজাপতিটা ধরে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল —ধরে ফেলেছি। বোন, প্রজাপতিটা ধরে ফেলেছি আমি। তারপর পেছন ফিরে দেখল, বোন নেই।'

'তারপর কি হলো ?' তারার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

'ছোট্ট ভাই জঙ্গলে তার ছোট্ট বোনটিকে খুঁজতে লাগল। গাছে ঠোক্কর খায়, ডালপালায় লেগে পড়ে যায়, কাঁটার ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয় কখনো। হাতের মধ্যে প্রজাপতিটা ছটফট করছে। সেটাকে হাতে চেপে ধরে বোনকে ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়ায় সে। এমনি করে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো, তবু বোনের দেখা পেল না।'

'বোনটা কোথায় গেলো ?'

'বোন অন্য প্রজাপতিটার পেছনে পেছনে গিয়েছিল না, সেই নীল, সবুজ আর গোলাপী রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতিটার পেছনে ছুটেছিল। প্রজাপতিটা আগে

আগে যায়, জঙ্গল ঘন হয়ে ওঠে ক্রমশ, প্রজাপতিটা সেই জঙ্গলের ভেতর থেকে আরও ভেতরে উড়ে যায়। বোন পেছনে পেছনে ছোটে। প্রজাপতিটাকে লক্ষ্য করতে করতে ওর খেয়ালই নেই সে কোনদিকে যাচ্ছে। সামনে একটা ছোট্ট ঢাল ছিল। প্রজাপতিটা সে দিকে উড়ে গেলো। বোনও লাফ মেরে নীচে নামল। নীচে জঙ্গলের মধ্যে গভীর জলের এক ঝর্ণা ছিল। তাতে ডুবে গেলো সে।'

'হায় হায়!' তারার ডাগর ডাগর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'তারপর কি হলো?'

'দুপুর গড়িয়ে গেলো, সন্ধ্যে হলো, তবু যখন বোনের দেখা পেল না তখন ক্লান্ত হয়ে মাটিতে একটা ডুমুর গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল, তারই ওপর বসে পড়ল। এমন সময় তার কানে এল—যদি তোর বোনকে খুঁজে দিই, কি দিবি আমায়?

'ছেলেটি অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল, কিন্তু সে বুঝতেই পারল না আওয়াজটা কোন দিকে থেকে আসছে। এমন সময় আবার সে শুনতে পেল—ভাইকে বোন পাইয়ে দিলে আমি কি পাব? কথাটা বলছে তার হাতে ছটফট করতে থাকা প্রজাপতিটা। বাসন্তী লাল ও কালচে লাল রঙের প্রজাপতিটা আসলে একটা পরী।'

আশার আলো দেখতে পেয়ে তারার চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'যখন ও কথাটা বললে, তখন···?'

আমি বলে যেতে লাগলাম, 'ছেলেটি বললে—যদি তুই আমার বোনকে পাইয়ে দিস, আমি তোকে ছেড়ে দেবো।

—আগে ছেড়ে দে আমায়।

—এই নে। বলে ছেলেটি প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিলো। সে তার রঙীন ডানা মেলে উড়তে উড়তে বলল—আমার পেছনে পেছনে আয়।

'প্রজাপতি তাকে বড় বড় পাথর, গাছপালা, ঝোপঝাড়, টিলা, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পার করে নিয়ে গেলো উপত্যকায়, যেখানে সেই গভীর ঝর্ণাটা রয়েছে। ওই ঝর্ণাতেই তার বোন ডুবেছিল। ঝর্ণার ধারে ঘাসের ওপর গাঢ় কালচে লাল রঙের একটা ফুল ফুটে আছে। মসৃণ পাপড়ি, দেখতে ঠিক প্রজাপতির মতো। তোর চুলে যেমন একগোছা ফুল রয়েছে, তেমনি।

—এখানেই তোর বোন আছে। প্রজাপতিটা বলল।

—কোথায়?

—ও এই ঝর্ণায় ডুবে গেছে। প্রজাপতিটা আফশোসের গলায় জানাল।

'ছেলেটি তার বোনের জন্যে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে যখন প্রজাপতিটাকে 'মিথ্যেবাদী, ধোঁকাবাজ' বলে গালাগালি দিলো, তখন প্রজাপতি হেসে বলল—আমি তোর বোনকে বাঁচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বলো।

—প্রতিজ্ঞা কর, ভবিষ্যতে আর কখনও নিরপরাধ প্রজাপতি মারবিনে।

'ছেলেটি অকপটে প্রতিজ্ঞা করল। তখন প্রজাপতিটা তাকে বলল —আচ্ছা, তাহলে আমি যা বলি, কর। এই ঢাল থেকে নীচে ঝর্ণার ধারে চলে যা। ওই যে কালচে লাল রঙের ফুল ফুটে আছে, ওটা তোল।

—ফুল তুলে কি হবে ?

—আমি যা বলছি, তাই কর।

'তখন ছেলেটি ঢাল থেকে বহু কষ্টে ঝর্ণার ধারে গিয়ে পৌছাল। সেখানে কালচে লাল রঙের ফুল ফুটে আছে। যেই সে হাত বাড়িয়ে ফুলটা তুলেছে, অমনি তার হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো সেটা। আর যেখান থেকে সে ফুলটা তুলেছিল, সেখানেই তার বোন ভিজে একশা হয়ে জলে দাঁড়িয়ে।...'

'আরে !' তারা খুশিতে চিৎকার করে উঠল।

আমি বলে চললাম, 'ভাইবোন দু'জন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে কেঁদে ফেলল ওরা। সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। বেশ অন্ধকার। জঙ্গল থেকে ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু প্রজাপতি দুটো দয়া করে ওদের ডানায় বসিয়ে নিল। কারণ ওরা তো পরী। এখন ওদের ডানাগুলোও খুব বড় বড় আর ঝক্ঝকে। রাতের অন্ধকারে জোনাকির মতো জলজল করছে। ভাই-বোন দু'জনকেই ডানায় বসিয়ে নিয়ে জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে পরী দুটো চোখের পলকে ওদের বাড়ির বাগানে পৌছে দিলো।'

'খুব সুন্দর গল্প।' তারা খুশি হয়ে বনফ্‌শা ফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলো।

আমি বললাম, 'তখন থেকেই বাগানে আর ঝর্ণার ধারে পনেরী ফুল ফোটে, যাতে ছেলেমেয়েরা ওতেই খুশি হয়, নিরপরাধ প্রজাপতিদের প্রাণ নষ্ট না করে।'

কিন্তু তারার আর গল্পে মন নেই। যেই সে শুনেছে, ভাই বোনকে পেয়ে গেছে, অমনি গল্প শেষ হয়ে গেছে তার কাছে। এখন চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঝর্ণা থেকে দূরে পশ্চিম দিকে পেয়ারাগাছের ওপর। গাছটা জড়িয়ে একটা আঙুরের লতা উঠেছে। তারা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এস, ওখানে ছুটে যাই। যে জিতবে, সে পাঁচটা নাশপাতি পাবে।'

আমি বললাম, 'ইস্, আমি জিতলে তুই নাশপাতি পাবি কোথায় ?'

তারা খুব সরলভাবে জবাব দিলো, 'যদি আমি হারি, তোমার কাছ থেকে নিয়ে দিয়ে দেবো তোমায় !'

শর্তটা আমার আদৌ পছন্দ নয়। কিন্তু তারার সঙ্গে খেলতে গিয়ে ভালো হোক মন্দ হোক অনেক রকম শর্তই মেনে নিতে হয়। ওর সঙ্গে দৌড় লাগালাম আমি। তারা খুব জোর দৌড়তে পারে। কয়েকবার বাজি জিতেও নিয়েছে।

কিন্তু আজ আমিই জিতলাম। আর তারপরই নাশপাতির জন্যে তাগাদা দিতে লাগলাম ওকে। ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে ও বেশ উঁচুতে একটা আঙুরের লতা দেখালো, পেয়ারা গাছের ডাল থেকে দোলনার মতো ঝুলছে।

তারা বলল, 'এস, আমরা ওটায় দোল খাই।'

'আর যদি লতাটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যায়?'

'ছিঁড়বে না। আঙুরলতা খুব শক্ত। দেখছ না, গাছটাকে চারদিকে কেমন আঁকড়ে ধরে রেখেছে।'

কথাটা সত্যি। আঙুরলতা গাছকে আঁকড়ে ধরে থাকে। গাছের গোড়ার কাছ থেকে বেরিয়ে লতাগুলো গাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরে উঠে যায়। তাতে গাছটার কি রকম মনে হয়, সেটা অবশ্য আমার বোধগম্যের বাইরে। শুধু এটুকুই জানি, আমরা বাচ্চারা একই গাছ থেকে আঙুর আর পেয়ারা দুই-ই পেয়ে থাকি।

আমি বললাম, 'আমি আগে ঝুলব।'

তারা চিৎকার করে বলল, 'না আগে আমি।'

'না। আমি বাজি জিতেছি, সে জন্যে আগে আমি ঝুলব।'

'যদি তুমি আগে ঝোলো, তাহলে আমি তোমায় সেই পাচটি নাশপাতি দেবো না কিন্তু।'

'ঠিক আছে।'

আমি গাছে চড়ে সেই ডালটায় চলে গেলাম, যেটা থেকে আঙুরলতা দোলনার দড়ির মতো ঝুলছে। লতার দু'দিকটা দু'হাতে ধরে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দোল দিলাম। একবার চড়চড় করে একটা শব্দ হলো। ছোট ছোট ডাল আর লতার পাতা ঝরে পড়ল কিছু। কিন্তু লতাটা বেশ শক্ত। আমি মজা করে বেশ জোরে জোরে দোল দিতে লাগলাম।

'নেমে পড়ো, নেমে পড়ো। এ বার আমার পালা।' তারা নীচে থেকে আমার দিকে চেয়ে চিৎকার করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আমি নীচে নামলাম। তারপর তারা দোল খেতে লাগল। প্রথমে তো লতার দোলনায় মজা করে বসে আস্তে আস্তে দোল দিচ্ছিল। পরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে দোল দিতে শুরু করল। লতাটার জায়গায় জায়গায় চড়চড় করে শব্দ হলো। আমি ভয় পেয়ে নীচে থেকে চিৎকার করলাম, 'আস্তে তারা, আস্তে। লতা ছিঁড়ে যাবে।'

তারা বেপরোয়া গলায় বলল, 'ছিঁড়বে না, দেখে নিও। আমি তোমার চেয়েও বেশী উঁচুতে দোল খেয়ে উঠে যেতে পারি। বলো, ওই ডালটা ছুঁয়ে আসব?'

পেয়ারা গাছের ডালটা যথেষ্ট উঁচুতে। আমি দোল খাওয়ার সময় চেষ্টা করেছিলাম ডালটা ছুঁয়ে দিতে, কিন্তু পারিনি। সে জন্যে দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'ছুঁয়ে আয় না দেখি, দু'আনা দেবো।'

তারা প্রথম বারে দোল খেয়ে ওপরে উঠে গেলো, ছুঁতে পারল না, দ্বিতীয় বারেও না, তৃতীয় বারেও না। কিন্তু চতুর্থ বারে এমন জোর লাগাল যে, ওপরে উঠে গিয়ে ডালটা ধরে ফেলল। ডাল ভেঙে নিয়ে সে খুশিতে চিৎকার করে উঠেছে, এমন সময় লতার দোলনাটা এক দিকের ডাল থেকে খসে পড়ল। অমনি সে তীব্র বেগে ওপর থেকে নীচে পড়ছে, ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলাম ওকে ধরতে। ওপর থেকে সোজাসুজি সে প্রথমে আমার ওপর, তারপর আমাকে নিয়েই আছড়ে পড়ল মাটিতে। মাটির ওপর কয়েক ফুট আমরা দু'জনেই উল্টে-পাল্টে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে একটা পাথরে আমার মাথায় ঠোক্কর লাগল। কিছুক্ষণ পরে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন দু'জনেই রক্তাক্ত, দু'জনেই কাঁদছি।

তারা কাঁদতে কাঁদতে আমায় ভর্ৎসনা করতে লাগল, 'তুমিই নিয়ে এলে আমায় এখানে। নইলে আমি বিষ্টুর গরুর জন্যে ঘাস কাটছিলাম।'

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, 'আর আঙুরের লতায় ঝুলতে বললে কে ?'

কিন্তু ভাগ্য ভালো, আমরা দু'জনে বেঁচে আছি এখনো। ও যদি আমার ওপর না পড়ে সরাসরি মাটিতে পড়ত তাহলে নির্ঘাত মরে যেত। আর আমরা মাটিতে পড়ে যদি গড়িয়ে না যেতাম, তাহলে ওর ভারে গুরুতর আঘাত পেতে হতো আমায়। মাথায় অবশ্য বেশ লেগেছে, রক্তও ঝরছে, কিন্তু তবু তো প্রাণে বেঁচেছি। কাঁদতে কাঁদতে আমরা দু'জন বাড়ি ফিরতেই প্রথমেই তো একচোট মার খেতে হলো, তারপর ক্ষতস্থানে মলম ও পটি লাগানো হলো। পরে জানা গেলো, আমার মাথার খুলিটা শুধু ভাঙতেই বাকী আছে। কিন্তু তারার একটা হাতের হাড় ভেঙে গেছে। মাস দেড়েক ধরে হাতে কাঠি বেঁধে ঘুরে বেড়াতে হলো ওকে।

—আর আজ ?

এখন হৃদয়ের অনেক ক্ষতই মিলিয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মাথার সেই ক্ষতস্থানের চিহ্ন রয়ে গেছে এখনো। সেখানে একটা কালো আবের মতো হয়ে আছে। কখনো কখনো অন্যমনস্কতায় যখন সেখানে হাতের স্পর্শ লাগে, তখন মন থেকে বর্তমানের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা সরে যায়। মনের জগৎ জুড়ে তখন শুধু একটি দোলনা দোলে। আঙুরলতার সেই দোলনায় একটি দুষ্টু পাজি মেয়েকে শূন্যে দুলতে দেখি।

*　　　　*　　　　*

বাড়িতে এক অদ্ভুত অবস্থা। এ দিকে বাপ-মায়ের একমাত্র ছোট্ট ছেলে আমি, মাথায় চোট খেয়ে পটি বেঁধে বিছানায় পড়ে রয়েছি। ওদিকে মা মূত্রাশয়ের ব্যথায় বিছানায় ছটফট করে কাতরাচ্ছেন। আগে তাঁর ব্যথাটা বাপীর ওষুধে পাঁচ-ছ' দিনেই কমে যেত, তারপর কমতে কমতে এক সময় সেরে যেত একেবারেই। কিন্তু

এখন কিছুতেই কমছে না। উপরন্তু একদিন তো প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

এর আগে বাপীকে এত চিন্তিত কখনও দেখিনি। সারা তল্লাটে তাঁর চিকিৎসার সুনাম। কিন্তু মা-র অবস্থা দেখে তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে আছে, সে সময় সারাদিন তিনি মা-র পায়ের কাছে খাটের ওপর বসে তাঁর দেখাশোনা করতেন। জ্ঞান ফিরে এলে মা যখন ব্যথায় চিৎকার করতে শুরু করতেন, তখন তিনি উঠে গিয়ে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিতেন। কিন্তু সেটা তো অসুখ সারবার ওষুধ নয়! অবশ্য তাতে মা আরাম পেতেন কিছুটা এবং সন্ধ্যে ছটা-সাতটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতেন। তারপর ঘুম থেকে উঠলে বাপী ওষুধ খাওয়াতেন তাঁকে। তাতে ব্যথাটা সেরে যেত না, কিন্তু অনেকটা কমে যেত। মনে আছে, বাপী দিনের বেলা নানা রকম বই নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যেতেন, সম্ভবত মূত্রাশয়ের ব্যথার ওষুধ খুঁজতেন। নানা বই ঘেঁটে ওষুধ লিখে নিতেন। তারপর ডিসপেনসারিতে গিয়ে নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করে নিয়ে আসতেন।

সে দিন রাতে বাপী যখন বিছানায় শুতে যাচ্ছেন, তখন মা নিজের খাট থেকে কান্না-ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকা কেমন আছে?'

আমার জন্যে আর একটা খাট পেতে দেওয়া হয়েছে। আমি চুপটি করে বিছানায় শুয়ে আছি। পুরনো অভ্যেস মতো মা-বাপীর কথা শুনছি।

'ঠিক হয়ে যাবে।' ক্লান্ত-অবসন্ন বাপী দুঃখভারাক্রান্ত গলায় বললেন।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। তারপর মা আবার বললেন, 'ও তো পোড়ারমুখি তারার পেছন ছাড়ছে না!'

'বাচ্চা ছেলে তো, এক বয়েসী ছেলেপিলের সঙ্গে খেলতে চাইবেই।'

'কিন্তু পোড়ারমুখি তারা আমার বাছাকে মেরেই ফেলবে! পরমেশ্বর বাছাকে রক্ষা করেছেন, নইলে, তুমিই বলো না, মরে যেতে বাকী ছিল কোথায়! আমি তোমায় কত বলছি, টাউনে নিয়ে গিয়ে ওকে কোনো বোর্ডিং-এ রেখে এস।'

'বলার সময় প্রায়ই বলো। কিন্তু পাঠাতে গেলেই তোমার প্রাণ উড়ে যায়।'

'কি করব, একটাই ছেলে, মায়ের প্রাণ মানতে চায় না! তুমি কি বুঝবে! ন'মাস পেটে ধরতে হলে বুঝতে।'

'এখন তো আমি তোমার কথাই শুধু ভাবছি। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমার ব্লাডারে স্টোন হয়েছে।'

'সে কথা তো তুমি তিন বছর ধরে বলে আসছ!'

'কিন্তু এখন আর কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'সন্দেহ নেই তো শিগগির অপারেশন করে ফেলো। অদৃষ্টে থাকলে বাঁচব। নইলে এই যন্ত্রণা থেকে তো রেহাই পাব। এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছিনে।'

'অপারেশন করব কি করে, ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠছে যে!'

'কেন, তুমি তো বেশ কিছু এ রকম রুগী অপারেশন করেছ। এই তো গত বছর মৌজা বাগের নম্বরদার পীনদা খাঁ ব্লাডার অপারেশন করতে এসেছিল। তোমার কাছেই সেরে বাড়ি ফিরে গেলো। মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আবার ওটাও মনে আছে, গোয়ার পণ্ডিত তোতারামের বউ লক্ষ্মীর যে অপারেশন করেছিলাম। সেটাও ব্লাডারের অপারেশন, কিন্তু তার পরমায়ু শেষ হয়েছিল ওই হাসপাতালেই।'

'সে ওর বিধির লিখন ছিল, হয়েছে। আমারও যদি তাই থাকে, হবে। ভালোই হবে। তুমি বেঁচে থাকতেই মরতে পারব, স্ত্রীর এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?'

'তুমি মরবার কথা ভাবছ, আমি তোমায় লাহোরে পাঠানোর কথা ভাবছি।

'লাহোর···?' মা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

'হ্যাঁ, লাহোর। সেখানে আমার শিক্ষক কর্নেল ভাটিয়া রয়েছেন। ব্লাডার অপারেশনে তাঁর দারুণ হাত। আমি যেমন রোজ দাড়ি কামাই, এটা তাঁর কাছে তেমনি আর কি! তিনি যদি তোমার অপারেশন করেন, তাহলে আমার কোনো চিন্তা নেই।'

মা ভাবতে ভাবতে বললেন, 'কিন্তু আমরা লাহোর যাব কি করে? তিন দিন ঘোড়ায় যেতে হবে, তারপর একদিন লরীতে, তারপর একরাত রেলগাড়ীতে। তাছাড়া খরচপত্তরের কথাটাও ভেবেছ?'

বাপী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, খরচপত্তরের কথাটাই তো! যাওয়া-আসা, হাসপাতালে থাকা, অপারেশনের খরচ, সব মিলিয়ে হাজার দুয়েকের কম না।'

'কিন্তু দু'হাজার টাকা আসবে কোত্থেকে?' মা ভাবনায় অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তুমি যা মাইনে পাও, তা তো সংসারেই লেগে যায়। আর উপরি আমদানি ছোঁবে না বলে তো দিব্যি গিলেছ তুমি!'

'সেটা ঠিকই।' বাপী প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বললেন, 'কিন্তু, তুমি যদি তোমার গয়নাগুলো দাও······'

'নিজের গয়না দেবো?' মা বিস্মিত কণ্ঠে এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন কেউ তাঁর গলায় ছুরি ধরেছে বলে তাঁর গলায় কথা আটকে গেছে। বললেন, 'কাকার বৌ-এর জন্যে যে গয়না রেখেছি, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সেই গয়না দিয়ে দেবো? কি রকম কথা বলছ তুমি! আমি ওর বিয়ে দেবো তবেই আমার নিষ্কৃতি। দয়াময় পরমেশ্বর বাঁচিয়ে রাখুন। বাছা আমার বড় হোক। বিয়ে দিয়ে পালকিতে করে বউ আনব। আমার সব গয়না নিজের হাতে বউয়ের গায়ে পরিয়ে দেবো।'

তারপর মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আধো অন্ধকারে মা-র চোখ চকচক

করতে লাগল। আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় জলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখ দুটো। তাঁর ছেলে যেন বড় হয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রীদের আগে আগে চলেছে, সানাই বাজছে। বাড়িতে পাল্কি এসেছে, নববধূর ঘোমটা সরিয়ে মা তার চাঁদপানা মুখ দেখছেন। মুমূর্ষু মা মৃত্যুশয্যের ব্যথায় অস্থির হয়ে কি রকম স্বপ্ন দেখছেন! কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কখনো স্বামীর জন্যে, কখনো ছেলের জন্যে। কিন্তু নিজের কোনো কিছুর জন্যেই নয়। আবছা অন্ধকারে কোনো অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল তাঁর চোখ দুটি দেখে এই বাস্তব সত্যটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর মা বাপীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমোলে?'

বাপী কোনো জবাব দিলেন না। আস্তে আস্তে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন, 'বাঁশী যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে...'

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার সেই পচাসড়া গান—! রাতকালে ভগবানের নাম নাও একটু। দু' একটা ভজন গাও।'

কিন্তু বাপী গুনগুন করে গেয়েই চললেন, 'বাঁশী যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে...'

আমি সেই গানের সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা-র বিশ দিন কেটে গেলো। কখনো ব্যথা কমে, কখনো বাড়ে। কিছুতেই সারে না। ভীষণ রোগা হয়ে পড়েছেন তিনি। বাপীর চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ গভীর হয়ে উঠছে। মা অপারেশনের জন্যে যতই পীড়াপীড়ি করেন, বাপী ততই সেটা এড়িয়ে যান। কেন যে সেটা করছেন বুঝতে পারছিনে। নিশ্চয়ই এর মারাত্মক ফল হবে। কিন্তু ব্যাপারটা এড়িয়েই যাচ্ছেন তিনি। চোখ-মুখ একেবারে বসে গেছে, যেন তাঁর মনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। তিনি যেন ঠিক করতে পারছেন না, কি করবেন! একদিন রাত্রে আমি ও বাড়ির অন্যান্যরা ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে তিনি বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। দেওয়ালে টাঙানো কোটের পকেট হাতড়ে কি যেন একটা বার করলেন। তারপর মা-র শিয়রে গিয়ে জিনিসটা তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দাও।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি আছে ওতে?'

'হাজার দুয়েক টাকা।'

মা একেবারে বিছানায় উঠে বসলেন। বাতির আলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে মেটে নীল রঙের ডোরা দেওয়া থলেটায় উঁকি মেরে দেখলেন। ভেতরে একগোছা নোট। নোটগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে গুনলেন। পুরো দু' হাজার টাকা।

'কোথায় পেলে?'

বাপী চুপ করে রইলেন।

মা আবার তাগাদা দিলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করছি, কোথায় পেলে?'

বাপী কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ঘুষ নিয়েছি।'

মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন, টাকার থলিটা তাঁর দুর্বল হাতে কাঁপতে লাগল।

বাপী তখন আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'মৌজা পোখরের রাজপুতদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। দুই ভাইয়ের ঝগড়া একটা জমি নিয়ে। ঠাকুর চৈন সিং আর ঠাকুর নৈন সিং। দু' জনেই তাগড়া জোয়ান। খুব বড়লোক। টাকা-পয়সার যেমন অভাব নেই, জমি-জায়গারও তেমনি অভাব নেই। কারণ দু' জনের কাছেই রাজাসাহেবের জায়গির রয়েছে। কিন্তু জমি নিয়ে ঝগড়া শুরু হলো দু' জনের মধ্যে। দু'ভাই-ই জখম হয়ে কাল থেকে হাসপাতালে পড়ে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, কাল বলছিলে তুমি।'

'ঠাকুর চৈন সিং-এর আঘাত খুবই গুরুতর। নৈন সিং-এর আঘাতটা অবশ্য তেমন মারাত্মক নয়। যদি আপস-মীমাংসা না হয়, মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে নৈন সিং-এর বছর তিনেক সাজা তো হবেই। সে জন্যে নৈন সিং চায়, আমি যেন আমার ডাক্তারী রিপোর্টে তার আঘাতটা গুরুতর বলে লিখে দিই, যাতে চৈন সিং-এর তিন বছর সাজা হয়ে যায়। এদিকে চৈন সিং চায়, তার আঘাতটাই যেন বেশী মারাত্মক বলে লিখে দিই, যাতে নৈন সিং-এর তিন বছর সাজা হয়। কাল থেকে দু' জনেই ঘুষ দিতে চাইছে। চৈন সিং-এর আঘাত এমনিতেই গুরুতর, তাই সে পাঁচশো টাকার ওপর উঠতে চায়নি। কিন্তু নৈন সিং আজ দু' হাজার পর্যন্ত উঠল। সে জন্যে ওর কাছ থেকেই টাকাটা নিয়ে নিলাম।'

মা ভয় পেয়ে বললেন, 'এই দু'হাজার টাকা নিয়ে তুমি মিথ্যে রিপোর্ট লিখবে?'

বাপী বললেন, 'হ্যাঁ। তবে নৈন সিং যা চাইছে, আমি ততটা লিখব না। চৈন সিং যা চাইছে, তাও লিখব না।'

'কি লিখবে তাহলে?'

'আমি শুধু লিখে দেবো, চৈন সিং-এর আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। হাজার হলেও দুই ভাই তো। দু'জনেরই আঘাত অল্প বলে যদি রিপোর্টে লিখি, পরে দু' ভাইয়ের মধ্যে আপস হতে সুবিধে হবে।'

'মানে, তোমার কথা অনুসারে, তুমি একটা ভালো কাজই করলে?' মায়ের কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর মনের মধ্যে একটা টানা-পোড়েন। টাকার থলেটা নিতেও পারছিলেন না, ফেরত দিতেও পারছিলেন না। কখনো থলেটার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন, কখনো আবার হাতটা টেনে নিচ্ছিলেন। এক আশ্চর্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তারপর মা যেন নিজেই নিজেকে শাপ-শাপান্ত করে বললেন, 'কাকার বাবা, আমার জন্যে তোমায় ঘুষ নিতে হলো?'

মা যেন মনে মনে ভাবছেন, যিনি অন্যায়ভাবে কোনো দিন একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি, দেবতার মতো সেই মানুষটিকে আজ কি-না তাঁর মতো এক পাপিষ্ঠার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঘুষ নিতে হলো ···হায় ভগবান!

মা অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাতরাতে লাগলেন। নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন। তারপর এক সময় টাকাগুলো আবার খলেতে পুরলেন। মাথার কাছে সেটা রেখে দিয়ে বাতিটা কমিয়ে দিলেন। শুয়ে শুয়ে বাপীর বিছানার দিকে তাকালেন। কিন্তু বাপী ততক্ষণে লেপে মুখ ঢেকেছেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমোলে?'

বাপী মুখের ওপর থেকে লেপ না সরিয়েই জবাব দিলেন, 'না।'

'কি ভাবছ?'

বাপী একটুক্ষণের জন্যে তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখখানি লেপের বাইরে এনে বললেন, 'কাকার মা, কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে রয়েছে, আমাদের আদিপুরুষ মহাত্মা আদম, যার বংশধর আমরা, একবার ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার জন্যে তাঁকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। কিন্তু আমি ভাবি, শুধু মহাত্মা আদমকেই স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়নি, প্রত্যেক মানুষকেই জীবনে কখনো না কখনো স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হতেই হয়।'—কথাগুলো বলেই বাপী আবার লেপে মুখ ঢাকলেন। তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখখানি আর একবারও দেখতে পাইনি সেদিন।

• • •

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে এ কথা লেখার সময় সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি আজ আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর আমি ভাবছি, আমার বাপী সম্ভবত একবারই স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি এবং আমার মতো সহস্র সহস্র লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষকে জীবনে অসংখ্যবার স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করে নরকে নিক্ষেপ করা হয়। ভাবছি, এটা কি রকম বেঁচে থাকা! স্বপ্ন দেখি, মনে-প্রাণে দিনরাত কামনা করি সেই নতুন পৃথিবীর, যে পৃথিবীর স্বর্গের সুরম্য আশ্রয় থেকে কখনও কোনো মানুষকে বহিষ্কার করা সম্ভব হবে না।

ছয়

একদিন খবর এল, ফজ্জা ডাকাত মারা গেছে। পোস্ট-মর্টেমের জন্যে পুলিশ তার লাশ নিয়ে আসছে হাসপাতালে।

ফজ্জা একযুগ থেকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী তহশিল ফতেহ্‌গড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে রেখেছিল। তার লুঠতরাজে অতিষ্ঠ হয়ে রাজাসাহেব ঘোষণা করেছিলেন, যে-কেউ ফজ্জার মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকে নগদ দশ হাজার টাকা এবং জায়গির পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। ফতেহ্‌গড়ের সর্দার মুসা খাঁ বহুদিন থেকে ফজ্জার জন্যে ওৎ পেতে ছিলেন। সে জন্যে চারদিকে নিজের লোকজন ছড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। একদিন মাঝরাতে যখন ফজ্জা ফতেহ্‌গড়ের কেল্লার নীচে সর্দার মুসা খাঁ-র গাঁয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুসা খাঁ তার পিঠে ছ'-ছ'টি গুলি করে মেরে ফেলেন তাকে। তিনি এখন সাক্ষী-সাবুদ ও সনাক্তকরণের লোকজন সহ তার সেই লাশ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সদরে, যাতে খেতাব, জায়গির ও দশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার হস্তগত করতে পারেন।

সর্দার মুসা খাঁ নিজের কৃতিত্বে খুব খুশি। ফজ্জার আসল নাম ছিল ফয়েজ মহম্মদ খাঁ। দীর্ঘকাল থেকে সে ফতেহ্‌গড় আর দোহালার এলাকা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছিল। ফতেহ্‌গড় রাজাসাহেবের শাসনাধীন। আর দোহালা হচ্ছে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লোকেরা বলে, আজ থেকে একশো বছর আগে এই দুই এলাকাতেই গখড়দের আধিপত্য ছিল। একদিকে ইংরেজরা এবং অন্যদিকে রাজাসাহেবের ঠাকুর্দা একযোগে আক্রমণ করে এই স্বাধীন রাজ্যটিকে শেষ করে দেন। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও গখড়রা সহজে বশ্যতা স্বীকার করেনি। বীর-বিক্রমে প্রাণপণে লড়াই করে তারা, তবু শেষ পর্যন্ত হারতে হয় তাদের। কিন্তু গখড়রা হেরে গেলেও পরিস্থিতি দাঁড়াল অন্য রকম। এলাকাটা পুরোপুরি কারোরই কব্জায় এল না। কারণ গখড়রা ভীষণ লড়াকু আর স্বাধীনতা-প্রিয়। আজ পর্যন্ত সব সময়ই তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সে জন্যে ব্রিটিশ সরকার দোহালাদের এলাকায় এক বিরাট ফৌজের ছাউনি রেখেছে। এ দিকে দেশীয় রাজ্যের এলাকায় রাজাসাহেব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ফতেহ্‌গড়ের কেল্লায় এবং কোট্‌বলীর খাঁ-র গড়গুলোতে সব সময়ের জন্যে মোতায়েন রেখেছেন গখড়দের দমন করার জন্যে।

ফজ্জা নিজের এলাকার লোকজনদের মধ্যে কখনও লুঠতরাজ খুন-খারাবি করত না। কিন্তু ইংরেজ পুলিশ যখন তার কণ্ঠরোধ করল এবং চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল

ছড়িয়ে দিলো, তখন সে শোন নদী পার হয়ে চলে এল দেশীয় রাজ্যে। তারপর ফতেহ্‌গড়ের এলাকায় মনের ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করল সে। প্রথমে তো দোহালার ডেপুটি কমিশনার তাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে এসে যখন সে একদিন ফতেহ্‌গড় তহশিলের খাজনা দিন-দুপুরে লুঠ করে নিল তখন সেই ঘটনার পর থেকে রাজাসাহেবও তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তার মাথার ওপরে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু সেই পুরস্কার ঘোষণার দেড় বছরের মধ্যেও ফজ্জার নাগাল পেল না কেউ। সে সমানভাবে মনের সুখে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকল। তা ছাড়া দোহালা ও ফতেহ্‌গড় এলাকায় কোনো ডাকাতকে গ্রেপ্তার করাটাও সহজ কাজ নয়। সারা অঞ্চলটা শক্ত অনাবাদী পতিত জমি ও প্রস্তরাকীর্ণ মালভূমি। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ছাড়া কোনো গাছপালা নজরে পড়ে না। জল দুষ্প্রাপ্য, বৃষ্টিপাত খুব কম। কোথাও কোথাও অল্পসল্প জোয়ার, বজরা আর ভুট্টা জন্মায়। লোকজন ভীষণ গরীব ও কষ্টসহিষ্ণু। দারিদ্র্য সত্ত্বেও তারা নিজেদের এলাকার স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেয়। প্রত্যেকটি গ্রামে গোপনে বন্দুক তৈরি হয় এবং বেআইনীভাবে ইংরেজদের এলাকায় চলে যায় সেগুলো। এটাই এখানকার লোকদের সব চেয়ে বড় ব্যবসা।

ফজ্জা কোট্‌বর্সীর খাঁ-র বাসিন্দা ছিল। সে একজন কামারের ছেলে। দারুণ চমৎকার দো-নলা বন্দুক তৈরি করত সে। তার হাতের তৈরি বন্দুক দূর-দূরান্তরে যেত। এই কারবার করতে গিয়েই সে একবার ধরা পড়ে। ধরা পড়ে দোহালার কাছে বন্দুক বিক্রি করার সময় হাতে-নাতে। তিন বছরের জন্যে জেলে যেতে হয় তাকে। কিন্তু ফজ্জা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি তার বলিষ্ঠ শরীর। দেড় বছর জেল খেটে সে ফেরার হয়। নিজের এলাকার পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে ডাকাত হয়ে যায় সে।

খানমের সঙ্গে যদি ফজ্জার ভালোবাসা না হতো, তাহলে হয়তো সে এখনো বেঁচে থাকত। সর্দার মুসা খাঁ-র মেয়ে খানম। আর সর্দার মুসা খাঁ ফতেহ্‌গড়ের সর্বেসর্বা। সেখানকার সব চেয়ে বড় জমিদার। খানম তাঁর একমাত্র মেয়ে। শুনেছি, সে এমন সুন্দরী যে, রাওয়ালপিণ্ডি ও ইংরেজ এলাকার গুজর খাঁ থেকেও তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। সেই খানমকেই নিজের প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিল ফজ্জা।

সর্ব প্রথম সে খানমকে দেখেছিল শোনের মেলায়। প্রতি বছর বর্ষার সময় শোন নদীর ধারে শোনের মেলা বসে। একদিকে দেশীয় রাজ্য, অন্যদিকে ইংরেজদের রাজ্য—মাঝখানে শোন নদী বয়ে চলেছে। সেই শোন নদীর তীরে শাহ্‌ নজিরের মাজার (সমাধি)। মাজারকে কেন্দ্র করেই মেলাটি বসে। দোহালা ও ফতেহ্‌গড়ের গণ্যমান্য বন্দুক ছেড়ে, নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ঝগড়া-বিবাদ সব কিছু ভুলে

শাহু নজিরের মেলায় অংশগ্রহণ করে। শুনেছি, সেই মেলায় আজ পর্যন্ত কখনও কোনো গোলমাল হয়নি। এই মেলা গখড়দের জাতীয় মেলা। মেলা উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে গখড়রা এসে সেখানে সমবেত হয়। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে তারা নিজেদের জাতীয় গৌরবের কথা স্মরণ করে।

মেলায় মল্লযুদ্ধ হয়, পাঞ্জা লড়াই হয়, সবশেষে সাঁতার প্রতিযোগিতা। কারণ শোন নদী তার এলাকার লোকগুলোর মতোই মাথা-পাগলা। এখানে এসে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দু'দিকে উঁচু পাড়, মাঝখানে মারাত্মক বেগে শোন নদী সাঁকোর তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। সাঁকোর একটা প্রান্ত ফতেহ্‌গড়ের কেল্লায় গিয়ে মিশেছে, অপর প্রান্তটি গিয়ে শেষ হয়েছে ইংরেজ এলাকার কাস্টমস চেক পোস্টে। এখানে নদীর স্রোত সব চেয়ে তীব্র। আর ভরা বর্ষায় যখন এই মেলা বসে, তখন শোন নদীর স্রোতের তর্জন-গর্জন ও গেঁজলা-ভাঙা তরঙ্গের ফোঁস-ফোঁসানি দেখার মতো। দেখে মনে হয়, যদি হাজার মণ ওজনের পাথর স্রোতের মুখে এসে পড়ে, তবে তা খড়কুটোর মতো নিমেষে কোথায় ভেসে চলে যাবে। এ রকম ভয়ঙ্কর স্রোতে সাঁতার কাটা প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনা। কিন্তু গখড় যুবকেরা প্রতি বছর এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করার জন্যে খুশিতে নেচে ওঠে। কয়েক বার তো কয়েক জন প্রতিযোগী উন্মত্ত তরঙ্গে বেসামাল হয়ে অপর পারে গিয়ে পৌঁছাতেই পারেনি, ফিরেও আসতে পারেনি, স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল। কয়েক দিন পর তাদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল মাইল দশেক দূরে নদীর ধারে। তা সত্ত্বেও এই প্রতিযোগিতা যুবকদের খুব পছন্দ। কারণ এই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম স্থান অধিকার করে, সে গখড় সম্প্রদায়ের 'হিরো' বলে গণ্য হয়। প্রতি বছর সাত জন যুবকের একটি দল ওপারে যাওয়ার জন্যে ফতেহ্‌গড় কেল্লার পাঁচিলের নীচে এসে দাঁড়ায়। সাত জনের অন্য একটি দল এ পারে আসার জন্যে দোহালার তীরে দাঁড়ায়। একটি বিশেষ সঙ্কেতে উভয় দলই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। যে যুবকটি সবার আগে এপার থেকে ওপারে গিয়ে কিংবা ওপার থেকে এপারে এসে নদীর তীরে পৌঁছে যায়, তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় রূপোর হাতল-ওয়ালা একটি ছোরা। অনুষ্ঠানটি ভারি চিত্তাকর্ষক। যে প্রথম হয়, সে নদীর তীরে পৌঁছেই সবার আগে বিচারকমণ্ডলীর প্রধানের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। প্রধান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তার মাথা চুম্বন করেন, তারপর তার হাতে তুলে দেন জাতীয় ছোরা। ছোরাটি হাতে নিয়ে সে দু' পা পিছিয়ে আসে, তারপর ছোরাটি মাথার ওপরে তুলে প্রধানকে ফৌজি সেলাম জানায়। তখন প্রধান জিজ্ঞেস করেন, 'বলো যুবক, আর কি চাও?'

প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি বলে, 'শাহু নজিরের কৃপা আর প্রধানের আশীর্বাদ চাই।'—কথা এ বলে যুবকটি মাথা নত করে।

তখন প্রধান সামনে এগিয়ে গিয়ে যুবকের কাঁধে একখানি চাদর রাখেন। যুবকটি

দু'হাতে চাদরখানা মেলে ধরে। প্রধান সেই চাদরে নগদ পুরস্কার দেন। পুরস্কারের পরিমাণ একশো এগারো টাকা।

প্রতি বছর এই রকমই হয়। একইভাবে প্রশ্নোত্তর চলে, বিজয়ী প্রধানকে শ্রদ্ধা জানায়, প্রধান এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তার হাতে জাতীয় ছোরা তুলে দেন, যুবক ফৌজি সেলাম জানায়, প্রধান জিজ্ঞেস করেন, 'বলো যুবক, আর কি চাও?' যুবক বলে, 'শাহ্ নজিরের কৃপা আর প্রধানের আশীর্বাদ চাই।' যুবকের জবাবে খুশি হয়ে প্রধান তার কাঁধে চাদর রাখেন। যুবক চাদরখানা দু' হাতে মেলে ধরে চুপচাপ মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়। তখন প্রধান তার চাদরে একশো এগারো টাকা নগদ পুরস্কার দেন। ঢোল-তাশা বাজতে শুরু করে। গখড় যুবকেরা আনন্দে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে আসে, তাদের হিরোকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগে তারা। শত শত বছর ধরে এই হয়ে আসছে।

কিন্তু যে বছর ফজ্জা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল সে বছর মেলার সাত দিন আগে থেকেই দিন-রাত মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। সাধারণত এ রকম হয় না। অতি বৃদ্ধরাও স্মরণ করতে পারে না যে এ এলাকায় কখনও এমন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল কি-না। শোন নদীর জল সাঁকো থেকে মাত্র কয়েক গজ নীচে ছিল। কূল ছাপিয়ে জল গিয়ে ধাক্কা মারছিল কেল্লার পাঁচিলে। অন্য দিকে জল গিয়ে পৌঁছাল শাহ্ নজিরের মাজারের চাতালে।

সেই বছরই ফজ্জা ইংরেজদের জেল থেকে পালিয়ে এসে নিজের এলাকায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। ইতিমধ্যে সে দু'চারটে ফাঁড়িতে হামলা করেছে। গখড় যুবকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

সেই মেলাতেই খানমকে প্রথম দেখল ফজ্জা। খানম সর্দার মূসা খাঁ-র একমাত্র মেয়ে। সারা অঞ্চলে কুমারী মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে তার পরিচিতি। দীর্ঘাঙ্গিনী, কালো চোখ, মাথায় একরাশ চুল, পূর্ণ-যৌবনা। যুবকদের মন তোলপাড় করে সে মেলায় চলাফেরা করে। এ অঞ্চলে কোনো মেয়ের এমন পাগল-করে দেওয়া রূপ কখনও তারা দেখেনি। মেলায় খানমকে যে দেখল, সে-ই বুকে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ফজ্জা সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার যুবক। ছ' ফুটের ওপর লম্বা, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, চওড়া বুক। শরীর এমন মজবুত যে তার জন্মভূমির রুক্ষ পাহাড়ের নগ্ন বিশাল পাথররাও ভয় পায় যেন। কিন্তু সে যেই খানমকে দেখল, অমনি তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো—বুকের মধ্যে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। খানম একেবারে সোজাসুজি ভয়হীন দৃষ্টি মেলে তাকাল তার দিকে। তারপর সে তার বন্ধুদের সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেলো। অমনি ফজ্জার মনে হলো, কোনো ছায়া এসে সূর্যকে গ্রাস করেছে যেন।

ঠিক তখনই সে মনে মনে স্থির করল, সাঁতার প্রতিযোগিতায় তাকে অংশগ্রহণ

করতেই হবে। মেলায় যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। সে জন্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না মোটেই। নিরুপায় হয়ে ব্যাপারটা মেনেই নিয়েছিল সে। কিন্তু খানমকে দেখার পর থেকেই, কেন জানি না, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছে হলো তার। যেই সাঁতার প্রতিযোগিতার ঢোল বাজতে লাগল অমনি সে জাঙিয়া পরে এসে হাজির হলো। বন্ধু শাহনওয়াজ খাঁ-কে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। শাহনওয়াজ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু ফজ্জা হলো তার সর্দার। তাই শাহনওয়াজ ফজ্জাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

কিন্তু জলের স্রোত এমন তীব্র ও ভয়ঙ্কর যে, কোনো প্রতিযোগী এপার থেকে ওপারে গিয়ে পৌছাতে পারল না। ওপার থেকে এপারে এসে পৌছাল মাত্র দু'জন। তাদের যথাযোগ্য সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন সর্দার মুসা খাঁ। পেছনে তাঁর মেয়ে খানম দাঁড়িয়ে। চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল অন্যান্য লোকজন। সাঁতারু দু'জন এপারে এসে পৌছাতেই দোহালার দিক থেকেও লোকজন ঢোল বাজাতে বাজাতে সাঁকো পেরিয়ে এপারে ছুটে এল অনুষ্ঠান দেখতে।

ফজ্জাই প্রথম হলো। তার গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরছে। হাপরের মতো বুক ওঠা-নামা করছে। তীরে উঠেই সে জাঙিয়া মুচড়ে জল ঝরিয়ে দিলো। তারপর ভেজা হাতে ভেজা মুখ মুছে হাসতে হাসতে ছুটে গেলো সর্দার মুসা খাঁ-র দিকে। কাছে গিয়ে সেলাম জানাল।

মুসা খাঁ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফজ্জার কপালে তার মাথার ভেজা চুল এসে পড়ছে, সেই কপালেই চুমু খেলেন তিনি। তারপর কোমর থেকে জাতীয় ছোরা বার করে তার হাতে দিলেন। ফজ্জা দু'পা পিছিয়ে গেলো। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে জাতীয় ছোরা ওপরে তুলে দু'পায়ের গোড়ালি এক করে প্রধানকে ফৌজি সেলাম জানাল।

সর্দার মুসা খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো যুবক, কি চাও?'

'শাহ্ নজিরের কৃপা আর খানমের হাত...' কথাটা ফজ্জার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল যেন। তার চোখের দৃষ্টি সরাসরি খানমের দিকে।

খানম চমকে উঠে বিশাল-দেহী ফজ্জাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। তারপর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল সে। চাঁপার মতো তার গায়ের রঙ গোলাপের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোকের চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। এ কোন সাহসী বীর যে বাপ-পিতামহের রীতিনীতিকে ভেঙে ফেলল? সেই সঙ্গে এক মুহূর্তে এই জমজমাট মেলার মধ্যে সব চেয়ে বড় সর্দারের বেইজ্জতি করে বসল, আর সকলের সামনে প্রার্থনা করল তাঁর মেয়েকে?

সর্দার মুসা খাঁ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, 'ফজ্জা, তোর এত সাহস? একটা

মামুলি চোর-ডাকাত হয়ে তুই সর্দারের মেয়ের ওপর নজর দিস? পাজী! বেইমান! এই ভর-ভরন্ত মেলায় তুই বাপ-ঠাকুর্দার রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিলি! আজ তোকে কেটে টুকরো টুকরো করব।'

মুসা খাঁ এবং তাঁর গাঁয়ের বহুলোক কঙ্কাকে মারার জন্যে ছুটে গেলো। কিন্তু কঙ্কা পেছন ফিরে নদীর দিকে দৌড় দিলো। লোকগুলো তার পেছনে ধাওয়া করল —ধরেই ফেলত, কিন্তু কঙ্কা একটা উঁচু পাথর থেকে ঝাঁপ দিলো নদীতে।

মজা দেখছিল যারা, তারা রুদ্ধশ্বাসে কঙ্কার দিকে চেয়ে রইল। এ বার কিন্তু কঙ্কা সেই ভয়ঙ্কর নদী পার হয়ে শাহ্ নজিরের মাজারের চাতালে গিয়ে উঠতে পারল না। বরং সেখান থেকে অনেক নীচে, মেলা থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে এক জায়গায় তীরে উঠল। তারপর সে একটা পাথরে দাঁড়িয়ে ওপরে দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলল, 'মুসা খাঁ, মনে রাখিস, তোর মেয়ে এখন থেকে আমার।'

* * *

এখন সে মৃত। রীতিমতো পুলিশ পাহারায় তার লাশ হাসপাতালে আনা হয়েছে। আমি জীবনে কখনও হাসপাতালে এত লোক দেখিনি। হাসপাতালের চারপাশে যেন মেলা বসে গেছে। দলে দলে লোক আসছে বিদ্রোহীটাকে দেখতে রাজাসাহেব এই লোকটারই মাথার জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ এলাকাতেও টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে। শুনছি, দিন দুয়েকের মধ্যেই দোহাপার ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার নিজে আসছেন লাশ দেখতে। যতক্ষণ না তিনি আসছেন, ততক্ষণ কঙ্কার লাশ হাসপাতালের লাশ-ঘরে বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। লাশ-ঘরটা রয়েছে স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর নীচে মাঠের মধ্যে একটেরে। জায়গাটাকে আমি ভীষণ ভয় করি। আমি ওদিক দিয়ে কক্ষনো যাইনে। মা-ও আমায় ওদিকটায় কখনও যেতে দেন না। লাশ-ঘরের ভূত আর ডাইনীর গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি আমার ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তো বাপীর সাহস দেখে অবাক হয়ে যাই —লাশগুলোকে কি করে তিনি কাটা-ছেঁড়া করেন! কিন্তু সেটা আমার ছেলেবেলাকার কথা। আজ বড় হয়ে মৃতদেহ দেখে আমি আর বিস্মিত হইনে। মৃতেরা ভাগ্যবান যে তারা মরে যায়। বরং আশ্চর্য হই যারা বেঁচে থাকে তাদের দেখে। রাতদিন তাদের রূঢ় বাস্তবতার নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। নিজের চোখের সামনেই নিজের জীবনটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখে, আর সেটা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সমাজের লাশ-ঘরে পড়ে পড়ে পচে-গলে একাকার হয়ে যায়।

লাশ দেখার সাহস আমার নেই। সে জন্যে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। যারা লাশ দেখে বেরিয়ে আসছে, ভয়ে-বিস্ময়ে তাদের কথাবার্তা শুনছি। হাসপাতালের বাইরে বাগানে দু' জন চার জন মিলে এক-একটি জটলা তৈরি করে আলাপ-আলোচনা করছে। একটা যে ছোট ছেলে সেখানে রয়েছে, সেটা কেউ

গ্রাহ্যই করছে না। সে জন্যে আমি এ-জটলা থেকে সে-জটলায় ঘুরে ঘুরে তাদের কথা শুনে বেড়াচ্ছি। তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, মুসা খাঁ মারাত্মকভাবে ফজ্জার পিছু নিয়েছিলেন। ফজ্জা যখন দৌড়তে দৌড়তে ক্রমশ তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন মুসা খাঁ তার পিঠে গুলি করে তাকে খুন করেন। নইলে সম্ভবত মুসা খাঁ তাকে ধরে জীবিত অবস্থাতেই রাজাসাহেবের সামনে হাজির করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজাসাহেব মুসা খাঁ-র কৃতিত্বে খুব খুশি হয়েছেন। স্থির হয়েছে, দোহালা থেকে ইংরেজ সাহেব এসে লাশ সনাক্ত করে মুসা খাঁ-র পুরস্কারের কাগজে সই করে দিলে ফজ্জার মাথা কেটে ফেলা হবে। তারপর সেই মাথা বর্শার ডগায় গেঁথে সদরে জায়গায় জায়গায় দেখিয়ে বেড়ানো হবে, যাতে বদমাশ ও বিদ্রোহীরা সতর্ক হয়।

এ ব্যাপারে মুসা খাঁ নিজেও তাঁর তিরিশ-চল্লিশ জন অনুচরসহ হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। খর্বাকৃতি চেহারা; দোহারা গড়ন; মাঝবয়সী। গায়ের রঙ তামাটে। বড় বড় চোখ। চোখ দুটো ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল আমার। নিষ্ঠুর বীভৎস হাসি। কথা বলতে বলতে কোমরে বাঁধা কার্তুজের পেটি নাড়-ছিলেন। মুসা খাঁ-কে দেখে আমার ভীষণ ভয় করছিল। সে জন্যে আমি তাঁকে দূর থেকে দেখেই বাড়ি পালিয়ে গেলাম। হাসপাতাল যাওয়ার জন্যে মা আমায় খুব বকলেন, তারপর দিনভর বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করে দিলেন।

বেশ একটু রাত্রি হলে বাপী ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন। কিন্তু মা আজ তাঁকে বাংলোর বারান্দাতেই দাঁড়াতে বললেন। মা-র এটা দস্তুর যে, হাসপাতালে যে দিন লাশ আসে, সে দিন তিনি বাপীকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না। পুজোর ঘরে মুখ-ঢাকা টিনে সযত্নে গঙ্গাজল রাখা আছে, সেই গঙ্গাজল এনে যতক্ষণ না বাপীর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে, ততক্ষন তিনি বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না। সে জন্যে আজও তিনি বাপীকে বারান্দায় দাঁড়াতে বললেন। তারপর গঙ্গাজল এনে দূর থেকেই তিনি বাপীর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। একখানা নতুন কোরা ধুতি দিলেন কাপড় বদলাবার জন্যে। বাপী সেই ধুতি কোমরে জড়িয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। মা তাঁকে সোজা গোসলখানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই গরম জল প্রস্তুত রয়েছে। চান-টান সেরে নতুন কাপড় পরে ডাক্তারবাবু গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন, তবেই মা-র স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর আমরা তিনজনেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। তারপর বাপী সোজা তাঁর শোবার ঘরে চলে গেলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষন ধরে একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এভাবেই দু'তিন ঘন্টা কেটে গেলো। তারপর যখন তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন যেন মা-র কথা মনে পড়ল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকার মা, ঘুমিয়ে পড়লে, না জেগে আছ?'

মা ভয়ে জড়সড় হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে জবাব দিলেন, 'না, ঘুমোইনি।'

'তাহলে কথা বলছ না যে!'

'কি বলব! আমার তো সেই মোটা ডাকাতটাকে ভয় করছে, লাশ-ঘরে পড়ে রয়েছে না এখনো!'

'ও ডাকাত ছিল না।'

'ডাকাত ছিল না তো কি ছিল?' মা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

বাপী মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'ও তোমার-আমার মতোই একজন মানুষ ছিল। নিজের লোকদের ভালো করার জন্যেই কাজ করত সে।'

মা দপ করে জ্বলে উঠলেন, 'রাখো তো তোমার ও সব! তুমি যে কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলো বুঝি না। সারা সংসারের লোক জানে, ফজ্জা এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। গোটা দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছিল। সে জন্যেই তো রাজা তার মাথার ওপর পুরস্কার ধরেছিলেন। ভগবান ঈশা খাঁ-র মঙ্গল করুন, জুলুমবাজটাকে গুলি করে মেরেছে।'

'ঈশা খাঁ নয়, মুসা খাঁ!'

'ওই একই কথা। এই সব হতচ্ছাড়া মুসলমানদের নাম একই রকম। আমি তো বুঝতেই পারিনে......' মা হাত নেড়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন।

বাপী মুচকি হেসে বললেন, 'আর হিন্দুদের নাম কি এক রকম হয় না? ইন্দ্র, বীরেন্দ্র, মহেন্দ্র, রাজেন্দ্র, গজেন্দ্র —সবই ইন্দ্র আর ইন্দ্র।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না কেউ! সব সময় মুসলমানদের টেনে কথা বলো। এখনই তো তোমার কাছে ফজ্জা ডাকাত ডাকাতই নয়। কাল বলবে, ঈশা খাঁ...'

বাপী আবার বললেন, 'ঈশা খাঁ নয়, মুসা খাঁ।'

'আচ্ছা বাবা, মুসা খাঁ তো মুসা খাঁ-ই হলো। তারপর?'

'তারপর ঘটনাটা হলো এই যে, মুসা খাঁ লড়াই করে ফজ্জাকে মারেনি...'

'সেই এক কথা! বলেছি না, ফের তুমি নিজের উল্টোপাল্টা থিওরিতেই ফিরে আসবে!' মা একটু রেগে বললেন।

বাপী বলে যেতে লাগলেন, 'লোকে বলছে, ফজ্জা মুসা খাঁ-র মেয়ে খানমকে ভালোবাসত। খানমকে ভালোবাসত কিন্তু খানমের বাবা মুসা খাঁ ছিলেন এর বিরুদ্ধে। তাতে আবার দেশীয় রাজা ও ইংরেজ রাজা দু' জায়গা থেকেই ফজ্জার ওপর ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল। তাই ফজ্জা খানমের সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করত। সে দিনভর পাহাড়ের খানাখন্দে লুকিয়ে থাকত আর দূর-দূরান্তরে ডাকাতি করতে যেত, সেনা-পুলিশ সবাইকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে এক লাফে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। সারা এলাকার যুবকরা তার পক্ষে ছিল। তরুণী মেয়েরা তার নামে গান গাইত। ও ছিল ওদের এলাকার সবচেয়ে বড় বীর। খানম ফজ্জাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। গাঢ় অন্ধকারে কেল্লার পাঁচিলের ধারে ওরা

দেখা-সাক্ষাৎ করত। কয়েক ঘন্টা ধরে গল্পসল্প করে তারপর ফজরের আগেই ফজ্জা হয় ফতেহ্গড়ের পাহাড়ী এলাকার রাস্তা ধরত, না-হয় নদী পার হয়ে দোহালায় চলে যেত। আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি তাকে।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কি করে ধরা পড়ল ?'

'খানমের এক মাসি তাকে এ ব্যাপারে বরাবর সাহায্য করত। সে-ই একদিন মূসা খাঁ-র কাছে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেয়।'

'হায় রে মুখপুড়ি! বুড়ি থুখ্‌ড়ি হয়েও তোর লজ্জা করল না একটু!' খানম আর ফজ্জার ওপর মা-র যেন ভীষণ করুণা হলো। নিতান্তই গল্প শুনছিলেন, কিন্তু তিনি যেন এখন সেই মাসিটাকে সামনে পেয়ে বললেন, 'বাছাদের ওপর তোর একটু দয়া হলো না, তাদের সর্বনাশ করার জন্যে তোর লজ্জা হলো না এতটুকু ?'

তারপর বাপীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কি হলো ?'

'তারপর হলো কি, না মূসা খাঁ খবর পেয়েই ফজ্জাকে ধরার জন্যে গাঁয়ের চার-দিকে জাল ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কেল্লার সেনাপতিকে কোনো খবর দিলেন না। কারণ পুরস্কারটা যদি সেনাপতির হাতেই চলে যায়! রোজ রাতে তাঁর লোকজনেরা পাহারা দেয়। আর তিনি সব সময় তাকে তাকে থাকেন, খানম রাতে কখনো বাইরে বেরোলে তার পিছু নেবেন।'

'তারপর ?' মা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিলেন।

বাপী বললেন, 'প্রথম তিনদিন তো কিছুই হলো না। খানম মজা করে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। চতুর্থ দিন, তখন মাঝ রাত্তির, খানম উঠে বসল, মাসিকেও জাগিয়ে দিলো। তারপর খানম চুল বাঁধল, কাপড় পরল। নীল রঙের জরিদার সালোয়ার-কামিজ পরে মাথায় রেশমী ওড়না দিয়ে সে চলল তার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে।'

'হায় হায়!' মা হা-হুতাশ করতে লাগলেন।

'মাসি সঙ্গে রয়েছে।'

'কুটনী—ডাইনী! ওর মাথার উকুনগুলো সাপ-বিছে হোক।' মা রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে বললেন।

বাপী বলে চললেন, 'কেল্লার পাঁচিলের ধারে ওরা দু'জন দেখা করল। সেখানে বসে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল তারা। তারপর তিন প্রহর রাত যখন শেষ হতে চলেছে, তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় ফজ্জা উঠল সেখান থেকে। গাঁয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে সেই রাস্তাটা ধরল, যে রাস্তাটা গাঁয়ের বাইরে দিয়ে ফতেহ্গড়ের দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। সেই পাহাড়েই তার গোপন আস্তানা। এদিকে নীচের রাস্তা ধরে ফজ্জা চলেছে, ওদিকে ওপরের রাস্তা ধরে খানম তার মাসিকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ে ফিরছে। অন্ধকারে তাদের ছায়া ছায়া শরীর রাস্তার সঙ্গে মিশে একাকার। ফজ্জা কখনো ওপরের দিকে চেয়ে খানমের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখে খুশি

হয়ে উঠছে, আবার কখনো ফজ্জাকে নীচে চলে যেতে দেখে থানমের মন তোলপাড় করছে।'

'তারপর?'

'তারপর ফজ্জা যখন নদীর ধারে একটা খোলা জায়গা পার হয়ে, ঘুরে পাহাড়ের দিকে মোড় নিল, অমনি কে যেন পেছনে পাথরের আড়াল থেকে তার পিঠে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করল। একসঙ্গে ছ' ছ'টি গুলি এসে তার পিঠ একেবারে ঝাঁঝরা করে দিলো। ফজ্জা জোরে চিৎকার করে উঠল, 'থানম!' ওপরের রাস্তায় যেতে যেতে থানমও গুলির আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠল। সে হুটোপাটি খেয়ে দৌড়তে দৌড়তে নীচের সেই মোড়ে এসে দেখল, রক্তে মাটিতে মাখামাখি হয়ে তার প্রিয়তম সেখানে পড়ে রয়েছে। নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ শরীর। থানমের বাবা সেই লাশের কাছেই দাঁড়িয়ে হাতে রিভলবার নিয়ে। মুচকি মুচকি হাসছেন তিনি।'

মা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। নীরবে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তো এমনভাবে বললে, যেন সে সময় ওখানে হাজির ছিলে তুমি!'

বাপী বললেন, 'আমি নিজে ছিলাম না, কিন্তু যে ছিল, সে নিজেই আমায় এ সব কথা বলেছে।'

'কে?'

'থানম।'

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'থানম এখানে এসেছে? —এই সদরে?'

বাপী ফিসফিস করে বললেন, 'হ্যাঁ, বাইরের বারান্দায় বসে রয়েছে এখনো।'

মা একেবারে চমকে উঠলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে এসেছে? এই বাংলোয়? কি চায় ও?'

'ওর ইচ্ছে, একবার ফজ্জাকে দেখবে।'

মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন, 'ও যে এখানে এসেছে, সে কথা ওর বাবা জানে?'

'না। ও লুকিয়ে এখানে এসেছে। ও বলছে, আমি যেন ফজ্জার লাশটা ওকে একবার দেখাই।'

'কিন্তু ফজ্জার লাশ তো লাশ-ঘরে রয়েছে!'

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু লাশ-ঘরের চাবিটা তো রয়েছে আমার কাছে।'

'এই সময় —এই মাঝরাতে তুমি লাশ-ঘরে ঢুকবে?' মা-র গলা ভয়ে কেঁপে উঠল।

'ক্ষতি কি?'

'কেউ যদি জানতে পারে? রিপোর্ট করে দেয় যদি কেউ? কথাটা রাজা-সাহেবের কানে গিয়ে ওঠে যদি?'

'এই অন্ধকারে কে আর দেখছে?'

'না না, আমি তোমায় যেতে দেবো না।' মা যেন ব্যাপারটা ওখানেই নিষ্পত্তি করে দিলেন। বললেন, 'তোমার তো মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে। তোমার মগজে বুদ্ধি-শুদ্ধি বলে কোনো জিনিস নেই। আমি নিজে বাইরে যাচ্ছি, খানমের সঙ্গে কথা বলে আসছি।' মা বিছানা থেকে উঠে পড়লেন।

বাপী ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'অমন কোরো না, অমন কোরো না। ওর মনটাকে ভেঙে দিও না একেবারে। সামান্য তো ব্যাপার!'

'বেশ বেশ, তাতে যদি চাকরি চলে যায়, চলে যাক, কেমন! খুব তামাশার কথা, তাই না? যে মরবার সে তো মরে গেছে, আমাদের রুজি-রোজগারটাও সঙ্গে নিয়ে যাবে না-কি!'

মা তৎক্ষণাৎ বাইরে যাওয়ার জন্যে বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। বাপীও পেছনে পেছনে দৌড়লেন। সতর্ক পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। বারান্দায় গেলেন না। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলেন, বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। দুই খুঁটির মাঝখানে একটি লণ্ঠন ঝুলছে। তার আলো এসে পড়েছে মেয়েটির শ্রান্ত-ক্লান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখের ওপর। মাকে দেখে মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তাকে মা-র চেয়েও বেশী লম্বা বলে মনে হলো আমার। তার মাথার কালো চুল পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করছে। আমি জীবনে কোনো মেয়ের এমন দীর্ঘ চুল দেখিনি। ফর্সা চেহারা। ঘন কালো চোখ। একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। মাকে দেখেও সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মা গর্জন করে বললেন, 'চলে যাও।'

'না না, কাকার মা···' বাপী ব্যাকুল হয়ে বললেন। কিন্তু মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো।' তারপর খানমের দিকে ফিরে আঙুল তুলে বললেন, 'সোজা চলে যাও এখান থেকে। নইলে আমি এক্ষুনি পুলিশ ডাকব।'

খানম মৃদুকণ্ঠে বলল, 'শুধু একবার দেখতে দিন আমায়।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আর দেখে কি করবে?'

'আমি ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।' খানমের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

'তুমি কি পাগল হয়েছ! মড়ার সঙ্গে কেউ কি কথা বলতে পারে?'

খানম স্থির বিশ্বাসে বলল, 'আমি বলব। আমায় শুধু একবার দেখতে দিন। মাত্র একবার।'

মা কেঁদে ফেললেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'যা হতভাগি, চলে যা এখান থেকে। মরা মানুষের সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতে পারত, তাহলে কোনো মেয়ে বিধবা হতো না, কোনো ছেলেমেয়ে অনাথ হতো না। কিন্তু মরা মানুষ কি কথা শুনতে পায়?'

খানম অনেকক্ষণ ধরে মাকে চেয়ে চেয়ে দেখল। তার চোখের দৃষ্টি একবার মা-র দিকে, একবার বাপীর মুখের দিকে ঘুরতে লাগল। শেষে হতাশ কণ্ঠে বলল,

'হ্যাঁ সত্যিই মরা মানুষ কথা শুনতে পায় না। সে জন্যে আপনিও হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না। ডাক্তারবাবুও শুনতে পাচ্ছেন না। এখানে কেউই কোনো কথা শুনতে পায় না। এখানে কি সবাই মরা মানুষ!'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল খানম। মশালের মতো ধক্‌ধক করে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। তারপর আর কিছু না বলে বারান্দা থেকে নেমে গেলো।

*　　　　*　　　　*

পরদিন খানম ম্যাজিস্ট্রেট লাল খানের আদালতে দরখাস্ত করল যে, সে ফজ্জার বিধবা স্ত্রী। অতএব ফজ্জার লাশ তার হাতে দেওয়া হোক। দরখাস্ত নিয়ে সে নিজে যখন আদালতে হাজির হলো, তখন চারদিক থেকে লোক ভেঙে পড়ল। আদালত-কক্ষ থেকে অনেককে বার করে দিতে হলো শেষ পর্যন্ত। আদালতে সে এলাকার সমস্ত অফিসার ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সর্দার মুসা খাঁ-ও ছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফয়েজ মহম্মদ তোমার কে?'

খানম নির্ভয়ে জবাব দিলো, 'সে আমার মাথার মুকুট।'

'ওর সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

'না।'

'তাহলে ওর সঙ্গে কি তোমার কোনো গোপন সম্পর্ক ছিল?'

'না।' খানম রাগে ফেটে পড়ল যেন। বলল, 'আমি কুমারী মেয়ে। সে আজ পর্যন্ত আমার দেহ স্পর্শ করেনি। কিন্তু তবু সে ছিল আমার মাথার মুকুট। দয়া করে ওর লাশ আমার হাতে দিতে আদেশ দিন।'

মুসা খাঁ সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'হুজুর, এ আমার মেয়ে। আমার অনুমতি ছাড়াই সে বাড়ি থেকে চলে এসেছে এখানে। ওকে আমার হাতে অর্পণ করুন।'

খানম গর্জন করে উঠল, 'আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকের মেয়ে নই। আমি ফজ্জার বিধবা স্ত্রী। তার লাশ আমার হাতে দিন।'

ম্যাজিস্ট্রেট লাল খান খানমকে বুঝিয়ে বললেন, 'খানম, তুমি একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার ও নম্বরদারের মেয়ে। তোমার বাবা এমন একজন বিপজ্জনক বিদ্রোহীকে হত্যা করেছেন, যার মাথার ওপর দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এ কাজ করে তিনি আমাদের সবাইকে খুশি করেছেন। তোমার বাবা ইংরেজ সরকারের কাছ থেকেও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। রাজাসাহেবের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, খেতাব এবং জায়গির পাবেন। এমন একজন সম্ভ্রান্ত মানুষের মেয়ে হয়ে তোমার এ ধরনের কথাবার্তা কি শোভা পায়!'

খানম মৃদু কণ্ঠে, অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'আজ এই ভরা আদালতে দাঁড়িয়ে আমি বলছি, আমার আব্বাও আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনিও

শুনুন, যে পুরস্কারের লোভে আমার আব্বা এই কাজ করেছেন, সেই পুরস্কার তিনি কখনও পাবেন না। কারণ বিশ্বাসঘাতককে কখনও পুরস্কার দেওয়া হয় না, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ব্যস, আদালত আমার দরখাস্ত বিবেচনা করুন।'

'না-মঞ্জুর!' ম্যাজিস্ট্রেট দাদ খান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

*　　　　*　　　　*

আদালত থেকে বেরিয়ে খানম এমন দ্রুত উধাও হয়ে গেলো যে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। মুসা খাঁ তাঁর মেয়ের সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠিয়েছিলেন, পুলিশও খুব দৌড়-ঝাঁপ করল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না তাকে। এইভাবে হুমকি দিয়ে খানমের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে লোকেরা নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু করল। কেউ বলল, 'মুসা খাঁ-র বিপদ ঘটবে।' কেউ বলল, 'মেয়েই তাকে খুন করবে।' অবশ্য মুসা খাঁ সব সময় কোমরে রিভলবার গুঁজে ঘুরে বেড়ান। তা সত্বেও তাঁর নিরাপত্তার জন্যে দু'জন পুলিশ দেওয়া হলো তাঁর সঙ্গে। সব সময় তারা তাঁকে পাহারা দেয়। রাজাসাহেব মুসা খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন। আর প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে দিন ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার দোহালা থেকে এসে লাশ সনাক্ত করার আদেশ দেবেন, তার পর দিনই রাজাসাহেব সুসজ্জিত এক সভার আয়োজন করে নিজ হাতে মুসা খাঁকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন, সেই সঙ্গে খেতাব এবং জায়গিরও।

মুসা খাঁ এই ইন্টারভ্যু সেরে দারুণ খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

দু'দিন পরে ডেপুটি কমিশনার দেশীয় রাজ্যের সদরে এসে পৌঁছালেন। তারপর লাশ দেখার জন্যে হাসপাতালে গেলেন। কিন্তু এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো সকলকে। লাশ-ঘরের কাছে গিয়ে তারা দেখল, লাশ-ঘরের দরজার তালা ভাঙা এবং ফজ্জার মাথা উধাও। শুধু একটা দীর্ঘকায় ধড় এমন বিশ্রী অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে সেটা কিছুতেই চেনার উপায় নেই।

যে মাথার ওপর দশ হাজার টাকা পুরস্কার, সেই মাথা অদৃশ্য।

এ রকম মাথাবিহীন লাশ দেখে ডেপুটি কমিশনার লাশ সনাক্তকরণের কাগজ-পত্রে সই করতে অস্বীকার করলেন। আর ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার যখন অস্বীকার করে বসলেন, তখন দেশীয় রাজার কি সাধ্যি যে তিনি মুসা খাঁকে পুরস্কার দেন! ফলে হলো কি, মুসা খাঁকে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে হলো। আর তার কয়েক দিন পর তাঁর লাশ পাওয়া গেলো কেল্লার পাঁচিলের কাছেই।

*　　　　*　　　　*

যে দিন লাশ-ঘরের দরজার তালা ভাঙা ধরা পড়ল এবং ফজ্জার মাথা উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যের সময় বাপী দারুণ খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরলেন। গুনগুন করে গাইছেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে…'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাঙা কে ভাঙল ?'

জবাবে বাপী গুনগুন করতে লাগলেন, 'বাঁশী যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে…'

'বলে রাখছি, একদিন জেলে যাবে তুমি।'

'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে…'

'আর আমায় বাজারে বসে ভিক্ষে করতে হবে। আর তোমার ছেলে…'

'কুঞ্জবনে …কুঞ্জবনে …কুঞ্জবনে' বাপী আরও জোরে জোরে গাইতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর খাবার ঘরে বাপী মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকার মা, জানো, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিস কি ?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সোনা।'

'না —স্বাধীনতা! কাকার মা, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ আর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো স্বাধীনতা। আর ইতিহাস বলে যে, ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি যুগসন্ধিক্ষণে মানুষকে এর জন্যে বড় মূল্য দিতে হয়।'

সাত

শৈশবে যাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে শানোর মুখখানি আমার খুব মনে পড়ে। দুর্বল পাতলা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ছোটখাটো গড়ন, পাতলা পাতলা ঠোঁট, বড় বড় গোলাপী চোখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। গায়ের রঙ শ্বেতপাথরের মতো সাদা। পরনে সাদা ধুতি সাদা ব্লাউজ। সব সময় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা। তাকে দিনের পর দিন ক্রমশ অস্পষ্ট-হয়ে-যাওয়া ছবির মতো দেখাত। মেয়েটির ক্ষয়রোগ, আর সে জন্যেই ঘুষঘুষে জ্বর হতো।

সে সময় ক্ষয়রোগের কোনো ভালো চিকিৎসা-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়নি। রুগীরা প্রায়ই মারা যেত। খুব কম ক্ষেত্রে, নেহাতই কপাল ভালো হলে, সারত দু'একজন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন কিছু আবিষ্কারের দিকে বাপীর বরাবরই ঝোঁক ছিল। নিজের ছোট্ট সীমাবদ্ধ জগতে অপ্রতুল আসবাবপত্র নিয়েই সে চেষ্টা চালিয়ে যেতেন তিনি। প্রায়ই জটিল কেস নিজের হাতে তুলে নিতেন। যদি তাদের মধ্যে একজনকেও ব্যাধি থেকে নিরাময় করে তুলতে পারতেন, তা হলে ভীষণ খুশি হতেন। আর তার ফলে ক'দিন ধরেই তাঁর মেজাজ থাকত দারুণ হাসি-খুশি, সজীব ও প্রাণবন্ত।

মেয়েদের জন্যে হাসপাতালে একটি পৃথক ওয়ার্ড ছিল। কিন্তু বাপী শানোকে সে ওয়ার্ডে রাখলেন না। জেনানা ওয়ার্ড থেকে প্রায় একশো গজ দূরে একটা ছোট্ট বাড়ি ছিল, ওপরে টিনের ছাদ। পরপর ছ'টি কামরা তাতে। দুটি কামরায় আর্দালি থাকে; একটি কামরা পুরনো কমোড, চিলুমচি প্রভৃতি হাসপাতালের পুরনো আসবাবপত্রে ঠাসা। চতুর্থ কামরাটি সিনিয়র কম্পাউণ্ডার সাহেব বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে তাস খেলা ও আড্ডা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেন। পঞ্চমটিতে মালী তার বাগানের কাজকর্মের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখেছে। ষষ্ঠ কামরাটি কেউ ব্যবহার করতে চায় না। কারণ কামরাটি সম্পর্কে গুজব রয়েছে যে ওখানে কোনো রুগী রাখলে সে নির্ঘাত মারা যাবে। বাপী এ সব কথায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যখন পরপর তিন-চারটি এ রকম ঘটনা ঘটে গেলো, তখন বাপী পাঁচজনের মন যুগিয়ে চলার জন্যেই কামরাটা খালি ফেলে রাখলেন।

শানোকে সে কামরায় রাখা চলে না। সে জন্যে তিনি সিনিয়র কম্পাউণ্ডারের গল্প-গুজব করার কামরাটিকেই উপযুক্ত বলে মনে করলেন। অন্যান্য কামরার তুলনায় সেটির অবস্থা সব চেয়ে ভালো। তাই কম্পাউণ্ডারের দখল থেকে কামরাটি ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে শানোর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাতে সিনিয়র কম্পাউণ্ডারের

ভীষণ আপত্তি। কিন্তু বাপীর ধারণা, কম্পাউণ্ডার যখন থাকার জন্যে একটা কোয়ার্টার পেয়েছে, তখন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে চাইলে নিজের কোয়ার্টারেই করা উচিত। সিনিয়র কম্পাউণ্ডার মোতিরাম মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ হলো। কিন্তু অফিসারের হুকুম, কামরাটি তাকে ছেড়ে দিতেই হলো। সে দিন থেকেই শানোর দুশমন হয়ে দাঁড়াল সে।

সাধারণত রুগীর সঙ্গে তার বাপ ভাই বোন স্বামী কিংবা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন কেউ আসে এবং চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালেরই কোনো না কোনো বারান্দায় পড়ে থাকে। শানোর সঙ্গে তার শ্বশুর এসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে সে সব চেয়ে বড়লোক। ইচ্ছে করলে শানোর জন্যে পেইং বেডের ব্যবস্থা করতে পারত। বড়লোকেরা সাধারণত তাদের রুগীদের জন্যে তাই করে। কিন্তু সে শানোর জন্যে কোনো দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিতে রাজি হলো না। কয়েক দিন শানোর কাছে থেকেই নিজের গ্রামে ফিরে গেলো।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শানো তার খাটখানা কামরা থেকে বার করে রোদ্দুরে নিয়ে আসে। খাটে শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়ায়, কিংবা রোদ্দুরে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় অথবা খাবার খায়। খুব কম কথা বলে। আজ পর্যন্ত কেউ তার মুখ থেকে একটাও চড়া সুরে কথা শোনেনি। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে রাখবেই।

কিন্তু একবার আমি তাকে ঘোমটা না-থাকা অবস্থায় দেখে ফেলেছিলাম। কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। আর তাকে সে-অবস্থায় দেখেই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। আমি আমাদের বাংলো থেকে দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছি —দুপুরে খেতে আসার জন্যে বাপীকে ডাকতে। চনচনে রোদ্দুর, কিন্তু হাওয়া দিচ্ছিল বেশ জোরে। শানো বাগানের এক কোণে ফুলের কেয়ারিতে বসে বসে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় তার মাথার ঘোমটা উড়ে গেলো। দেখলাম, তার মাথায় একগাছিও চুল নেই। তাই দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। শেভ করার পর বাপীর মুখখানা যেমন দেখায়, তেমনি তার সারা মাথাটা ন্যাড়া।

আমার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বাপীকে জানালে তিনি আমায় বললেন, 'শানো কুমারী বিধবা যে!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কুমারী বিধবা তো কি হয়েছে? সব মেয়ের মাথাতেই তো চুল থাকে। কিন্তু ও মাথা মুড়িয়ে ফেলে কেন?'

'নিজে থেকে মুড়িয়ে ফেলে না, মুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের এখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যদি কোনো কুমারী মেয়ে বিধবা হয়, তাহলে তাকে মাথা মুড়োতে হবে।'

আমি অনেক ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কুমারী মেয়ে বিধবা হয় কি করে?'

বাপী মৃদু হেসে বললেন, 'যে দিন শানোর বিয়ে হয়, সে দিন ছাদনাতলায় বিয়ের লগ্ন পার হতে না-হতেই ওর স্বামী মারা যায়। তাই ও কুমারী বিধবা।'

'তা ও আর বিয়ে করতে পারবে না?'

'না।'

'না কেন?'

'ব্যস্, এটাই নিয়ম।'

'এটা আবার কি রকম নিয়ম?' আমি বেশ ঝাঁজালো গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

এ সময় যদি মা থাকতেন, তা হলে এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ঠিক মারতেন আমায়। কারণ ছোট থেকেই উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করা আমার স্বভাব। কিন্তু বাপী আমার এ রকম প্রশ্ন করার জন্যে কখনও কিছু বলেন না, বরং খুশি হন। কিন্তু এখন বাপীও আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মৃদুকণ্ঠে গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে···।' এটা তাঁর পেটেণ্ট পদ্ধতি। যখন তিনি কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে চান না, কিংবা তা নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করেন না, তখন হঠাৎ মাঝখানে কথা বন্ধ করে দিয়ে গুনগুন করতে শুরু করেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে···।'

শেষ পর্যন্ত আমি বলে ফেললাম, 'মাথায় চুল থাকলে ওকে দেখতে আরও ভালো লাগত।'

জানিনে, বাপী তাঁর ছেলের এই মন্তব্যটিকে কিভাবে গ্রহণ করলেন। তিনি সে কথার কোনো জবাবও দিলেন না। সেই একইভাবে গুনগুন করতে থাকলেন এমন সময় আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। খাবার টেবিলে বসে এ-কথা সে-কথার মধ্যে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারলাম আমরা।

কিন্তু সেই দিনই আমি কম্পাউণ্ডার মোতিরামকে তার বন্ধু পূরণমল শাহের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুনলাম, 'শাহুজী, কিছু খবর রাখো? শানোকে ডাক্তারবাবুর ভালো লেগেছে।'

'অ্যাঁ? সত্যি না-কি?'

'একেবারে সত্যি। আজ নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি। উনি শানোকে বলছিলেন —মাথায় চুল রেখে দে তুই। মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু ডাক্তারবাবু সমানে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শেষে ও রাজি হয়ে গেলো। আর রাজি না হয়ে পারে? মেয়েটি যখন রাজি হলো, তখন ডাক্তারবাবু আমায় দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন —মাথা মুড়িয়ে মুড়িয়ে মেয়েটির মনে খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ও এখন ভুলতেই বসেছে যে সে একটা মেয়ে। আমি ওর মধ্যে নারীত্ব জাগিয়ে তুলতে চাই, যাতে ও জীবনে একটু আনন্দ-ফুর্তি অনুভব করে, নিজের ব্যাধিটার মোকাবিলা করার জন্যে একটু ক্ষমতা ফিরে পায়। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার মোতিরাম!'

পূরণমল শাহ্ বিদ্রূপের গলায় বলল, 'তাহলে ডাক্তারবাবু বেশ অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ হতে চলেছেন!'

'দাঁড়াও না, ক'দিন সবুর করো। কোন ব্যাপারে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ফলান, দেখতেই পাবে। হি-হি-হি···!' মোতিরাম হাসতে হাসতে বলল।

তার হাসিতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ঝরে পড়ছিল। আমার মোটেই ভালো লাগল না। বাপী যদি শানোকে মাথায় চুল রেখে দিতেই বলেন, তাহলে এমন কি খারাপ করেছেন তিনি? একটা ছোট ছেলেও বলতে পারে, মাথায় চুল রাখলে মেয়েদের ভালো দেখায়। আমার মা যখন মাথায় খোঁপা বেঁধে তাতে একটা ফুল গুঁজে দেন, তখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখায়। মোতিরামের বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গেলো কোথায়!

আমি কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিলাম। তাই দেখে মোতিরাম বেশ একটু চিন্তিত হলো। তারপর তড়াক করে উঠে এসে আমার কান ধরে ফেলল। ভয় দেখিয়ে বলল, 'খোকা, মাকে তার করে দে, যেন এক্ষুনি চলে আসে। নইলে ডাক্তারবাবু নাগালের বার হয়ে যাবে, হাঁা, বলে রাখছি!' এ কথা বলেই সে আমার কান ছেড়ে দিলো। তারপর তার বন্ধু পূরণমল শাহ্কে নিয়ে নিজের ছোট্ট বাংলোর দিকে চলে গেলো।

তার কথায় আমার ভীষণ রাগ হলো। কিন্তু আমি ছোট ছেলে, কি করতে পারি! মা এখানে নেই, লাহোরের হাসপাতালে পড়ে আছেন। তাঁর অপারেশনের জন্যে বাপী এক মাসের ছুটি নিয়ে লাহোর গিয়েছিলেন; আমিও সঙ্গে ছিলাম। ভালোভাবেই অপারেশন হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের মতে মাকে এখনো মাস তিনেক হাসপাতালে থাকতে হবে। এদিকে বাপী খুব বেশী ছুটি পাননি। তাই তিনি মাকে হাসপাতালে রেখে ফিরে এসেছেন। এসেই আবার হাসপাতালের কাজকর্ম বুঝে নিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে মা-র চিঠি আসে। চিঠিতে আমায় খুব আদর জানান। একবার তিনি আমার জন্যে কান্দাহারী ডালিম পাঠিয়েছিলেন পার্সেল করে। কারণ আমাদের এখানে কান্দাহারী ডালিম হয় না। তারা তো সেই ডালিম খেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওর ধারণা ছিল, আমাদের বাগানে যে ডালিম হয়, তার চেয়ে বড় ডালিম আর কোথাও হয় না। লাহোর থেকে ফিরে এসে আমি সেখানকার যে সব গল্প তাকে শুনিয়েছিলাম, সেগুলি সে কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না, কান্দাহারী ডালিম দেখে তবেই এত দিনে সে সব কথা বিশ্বাস হলো তার। কান্দাহারী ডালিমই তাকে একেবারে ঘায়েল করে দিলো। এখন সে ঠিক করেছে, শুধু আমাকেই বিয়ে করবে, আর বিয়ের পর লাহোরে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মতটা বদলে গেছে। কারণ এখন আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই, সে হলো মা-র নার্সের ছোট মেয়ে। লাহোরে সে আমার সঙ্গে বল খেলত। তার পরনে থাকত চমৎকার ফ্রক, মাথার চুলে রিবন। তাকে নিয়ে আমার আর তারার মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছে। তিন দিন তো আমরা

পরস্পরের সঙ্গে কথাই বলিনি। কিন্তু লাহোর বড় দূর। আর এখানে তারা ছাড়া আমার খেলার সঙ্গী-সাথী কোথায়? তাই ধীরে ধীরে সেই চমৎকার ফ্রক-পরা মেয়েটি আমার মন থেকে মুছে যাচ্ছে। আর আমিও বাধ্য হয়ে তারার সঙ্গে আবার ভাব করে নিয়েছি।

আমি মোতিরামের ভয়ঙ্কর গোঁফজোড়ার ভয়ে তার কথাগুলো বাপীকে বলিনি। মোতিরাম খুব শয়তান এবং বাজে ধরনের লোক। সে প্রায়ই আমার নামে উল্টোপাল্টা কথা বলে বাপীর কাছে মার খাওয়ায়। শুধু আমি নয়, কোনো ছেলেমেয়েই তাকে পছন্দ করে না। তার স্ত্রীর চেহারা শুকনো পাকাটির মতো, সে-ও বদমেজাজী। কখনো মালীর সঙ্গে, কখনো চাপরাসীর সঙ্গে, কখনো বা আর্দালির স্ত্রীর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করছে তো করছেই। আমি আর তারা কক্ষনো ওদের বাড়ির কাছ ঘেঁষি না। তবু মোতিরাম কিংবা তার স্ত্রী আমার মা-র কাছে কোনো-না-কোনো ব্যাপারে নালিশ পাঠাবেই।

শানো হাসপাতালে আসাতে বাপী আবার বেজায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তিনি কবিরাজী ও ইউনানী চিকিৎসা-ব্যবস্থারও কিছু কিছু খবর রাখতেন। তাই তিনি শানোর ওপর নানা রকম ওষুধপত্র ও চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। কখনো মিলিয়ে-মিশিয়ে, আবার কখনো পৃথক পৃথক ভাবে। আর তাতে শানোর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হলো।

আমার তো সেদিন থেকেই তাকে ভালো মনে হচ্ছে, যেদিন থেকে তার মাথায় চুল বাড়তে শুরু করেছে। এখন তার চুল লাহোরের মেমসাহেবদের মতো কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে। ফরসা চেহারা, কোঁকড়ানো কালো চুলে তাকে মোমের পুতুলের মতো ভারি শান্ত দেখায়। সকাল-সন্ধ্যে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নেয়। নিজের হাতে থালা-বাসন মাজে ধোয়। বাপী তার কামরার দুটি জানলার জন্যে নীল রঙের পর্দা আনিয়ে দিয়েছেন। সে তাতে নিজের হাতে লতা-পাতা-ফুলের নকশা তুলেছে। তার কামরার সামনে যে ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত মাঠ রয়েছে তার চারদিকে সে নানা রকমের ফুল-ফলের গাছ লাগিয়েছে। নানা রকম লতা ও পাতা-বাহারের গাছ। এখানে সে একা এসেছিল, এসেছিল এক তিক্ত ঘৃণ্য পরিবেশের অসহনীয় অবস্থা থেকে জীবনের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে। কিন্তু এখানে হাসপাতালের খোলা মাঠ এবং একজন সহৃদয় ডাক্তারের সহানুভূতি লাভ করে তার জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মাধুর্যের ফল্গুস্রোত বইতে শুরু করেছে। এখানে সে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এসেছিল। জীবনে যে কিছুই পায়নি, পনেরো বছর বয়সে কুমারী বিধবা, যার ভবিষ্যৎ মুড়নো মাথার মতোই সম্ভাবনাহীন, যার বাড়ির লোকজন রাত্রি দিন তার মৃত্যু কামনা করে, তার যদি ক্ষয়রোগ না হয় তো কি হবে! শানো জানত, তার ভাতার তাকে হাসপাতালে রেখে গেছে, যাতে সে তাদের চোখের আড়ালে থাকে। তা ছাড়া গ্রাম-ঘর জমি-জমা ভিটেমাটি থেকে

শুয়ে থাকলে তার আত্মীয়-স্বজনও কেউ তার দেখাশোনা করতে পারবে না। সে মারা গেলে তার ভাশুর তার মৃত স্বামীর জমি-জমা সব হস্তগত করে নেবে। কারণ শানোই এখন তার মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাই তার ভাশুর চায়, সে যেন এক্ষুনি মারা যায়। আর শানোও সেটা চাইত। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রথম বিশ-পঁচিশ দিন সে মনেপ্রাণে কামনা করত যত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু হয়, সকলের পক্ষে সেটা ততই মঙ্গল। কুমারী বিধবা পরিবারের কাছে এক অভিশাপ, সমাজের কলঙ্ক, আর তার নিজের কাছেও দুর্বহ বোঝা ছাড়া আর কি! যত তাড়াতাড়ি সেই বোঝা আগুনে পুড়ে ছাই হয় ততই ভালো।

কিন্তু ইনি কি ধরনের ডাক্তার, যিনি তাকে বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই জীবন হচ্ছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সে বিধবা হোক আর সধবাই হোক, ধনী হোক কিংবা দরিদ্রই হোক। পনেরো বছরের কুমারী বিধবাকে পুনর্বিবাহে যারা বাধা দেয়, তারাই পৃথিবীর অভিশাপ। সেইসব মানুষেরাই সমাজের জঞ্জাল, যারা অভাগিনী মেয়েকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তারাই তার জীবনের বোঝা স্বরূপ। তারা পৃথিবীতে অপরকে কখনও খুশি দেখতে পারে না। শানো এই সহৃদয় পুরুষটির চোখের দিকে তাকায়, তাঁর মধুর কথা শোনে, যখন তিনি তার নাড়ি দেখেন, তখন তাঁর হাতের স্পর্শ সে নিবিড়ভাবে অনুভব করে, আর তার নির্বাপিত হৃদয়ে এক উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলে ওঠে যেন, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা জাগে। লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে রাতের স্তব্ধতায় গুনগুন সঙ্গীত তাকে আকুল করে তোলে কোনো একজনের ছবিকে উপাসনা করার জন্যে। দিনদিন তার কাসির বেগ কমে আসে, জ্বরের প্রাবল্য হ্রাস পায়, তার সাদা ফ্যাকাশে গাল দুটোতে লাল আভা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। আর বাপাকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন অস্পষ্ট বিবর্ণ ছবিটিতে রঙ ভরে দিচ্ছেন, যেন তিনি শুধু ডাক্তার নন, শিল্পীও।

শানোর চুল যখন তার কাঁধে এসে পড়ল, তখন সে একদিন সসঙ্কোচে ডাক্তারবাবুকে বলল আয়না ও চিরুনির জন্যে। মেয়েরা যাকে ভালোবাসে, তাকে একান্ত আপনার বলে না ভেবে পারে না। আর পুরুষরা যাকে ভালোবাসে, তার ওপর প্রভুত্ব না করে পারে না। তাই ডাক্তারবাবু উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আয়না চিরুনি এনে দিতে পারি, যদি গন্ধ তেল ব্যবহার করতে রাজি থাকো তবেই।'

শানো বলল, 'ইস্‌, গন্ধ তেল? আমি বিধবা, গন্ধ-তেল কি ব্যবহার করতে পারি?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'করতে পার, করতে হবে। যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে জীবন, জীবনের সুরভি এবং তার যাবতীয় সুন্দর জিনিসকেই ভালোবাসতে হবে। কোনো মেয়ের স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীর শরীরটাও মরে যায়, এ কথা যারা ভাবে, তারা অতি নির্বোধ! কত ইচ্ছে, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন দেহ ও প্রাণের দাবি হয়ে বেঁচে থাকে। তা না থাকলে যে কিছুই হতো না।'

শানোর চোখ দুটো জলে ভরে আসে। বলে, 'সে যখন মারা যায়, তখন আমি কিছুই জানতাম না। আমি কখনও তার মুখটা ভালো করে দেখিনি, চিনতামও না তাকে। কিন্তু একদিন আমায় সবাই বলল যে, আমি না-কি বিধবা হয়ে গেছি! অথচ ডাক্তারবাবু, আমি কি বলব, আমার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা তো বিধবা হয়ে যায়নি! তাহলে কি করে আমার বিশ্বাস হবে যে আমি বিধবা! কিন্তু পনেরো বছর ধরে ওরা আমায় সেটাই বিশ্বাস করিয়ে আসছে। অনাহারে রেখে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, মারধর করে প্রাণান্ত করেছে আমায়। আমি সেই শস্যের মতো, যে শস্যের ওপর অনবরত মুষল চালানো হয় যতক্ষণ না তারমধ্যে থেকে শেষ দানাটিও বেরিয়ে আসে। শাস্ত্রে যা যা লেখা আছে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়েছে আমায়।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'জীবনের চেয়ে বড় শাস্ত্র আর কিছুই নয়।'

শানো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, 'রাম রাম, কি বলছেন ডাক্তারবাবু! এমন কথা বলবেন না। প্রলয় ঘটে যাবে যে!'

'আমি তো রোজই এ কথা বলি। কই, প্রলয় তো ঘটছে না?' —এ কথা বলে ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি চলে যেতেই শানো ভয় পেয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে সে।

হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হে ঠাকুর, ওঁকে ক্ষমা করো। ও এই রকমই না বুঝে-সুঝে কথা বলে। ওর যদি কোনো অপরাধ হয়, তাহলে আমায় শাস্তি দাও।'

এটাই তো বিপদ, আর এই জন্যেই নারীর অদৃষ্টে প্রায়ই দুর্বিপাক ঘটে। নারী যাকে ভালোবাসে, তার সমস্ত দোষ সমস্ত অপরাধ নিজের মাথায় তুলে নিতে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। আর পুরুষ যাকে ভালোবাসে, তার কোনো দোষ-ত্রুটি সে ক্ষমা করতে পারে না।

যেদিন ডাক্তারবাবু শানোকে আয়না চিরুনি আর সুগন্ধি তেল আনিয়ে দিলেন সেদিন হাসপাতালে যেন হুলস্থুল পড়ে গেলো। মোতিরাম তার বন্ধু পুরণমল শাহকে বলল, 'আরে হাসপাতালের মধ্যে কি কেচ্ছাটাই না হচ্ছে! আজ শানো চুল আঁচড়ে বিনুনি করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ডাক্তারবাবু নিজের হাতে এত্তো বড় একটা ডালিয়া ফুল তার চুলে গুঁজে দিলো!'

পুরণমল বলল, 'কিন্তু ছুঁড়িটাও দেখো না কেমন!'

'আর দেখেছ, শরীরটাও ওর কেমন ডাঁসা নাশপাতির মতো হয়ে উঠেছে!'

'আরে, ভালো ভালো খাবার জুটলে, পরনের ভালো কাপড়-চোপড় পেলে, থাকার জন্যে চমৎকার ঘর আর বেড়াবার জন্যে বাগান পেলে একটা ছুঁড়ি নাশপাতি কেন, আপেলের মতো লাল হয়ে উঠবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে!'

তারপর মোতিরাম আমায় দেখতে পেয়েই সামনে এগিয়ে এল। আমার কান টেনে ধরে বলল, 'খোকা, এখনো বলছি, মাকে আসতে বল। নইলে ডাক্তার নাগালের সীমা ছাড়িয়ে যাবে —হ্যাঁ, বলে রাখছি!'

● ● ●

বাপী দিনে চারবার শানোকে দেখতে যান। সকালে উঠে ওয়ার্ডগুলোতে রাউণ্ড দেওয়ার সময়, দুপুরে খেতে আসার আগে, বিকেল চারটেয় যখন পুনরায় হাসপাতাল খোলে তখন, তারপর রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আর একবার দেখতে যান তাকে। আর যখনই দেখতে যান, এক-দেড় ঘণ্টা তার কাছে বসে কাটান। শানোও তাঁর আসার পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে। তাঁকে দেখে সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। দু'তিনবার সে ডাক্তারবাবুকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু রাজি হননি। বলেছিলেন, 'যদ্দিন তোর জ্বর না সারছে, ততদিন তোর হাতের রান্না খাব না।'

শানো তার ডাগর ডাগর চোখে হাসির ঝিলিক তুলে ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বলেছিল, 'সত্যি। সেই কথাই রইল তাহলে।'

এই ঘটনায় দেড় দু' মাস পরে শানোর জ্বর ছেড়ে গেলো একেবারে। বাপীও তার ওখানে খেতে সম্মত হলেন। বলতে কি, রান্নার সমস্ত জিনিসপত্রই গেলো আমাদের বাড়ি থেকে। শানো নিজের হাতে রান্না করল। ডাক্তারবাবুকে খাইয়ে সে এত খুশি হলো যে, আনন্দের অতিশয্যে তার পর থেকেই সে প্রায়ই তাঁর পা টিপে দেয়। ডাক্তারবাবুর এই বোকামি দেখে আর্দালিরা অবাক হয়ে যায়। কারণ ডাক্তারবাবুর পা টিপে দেওয়া তাদেরই তো কাজ।

তারপর শানো ডাক্তারবাবুর জন্তে সোয়েটার বুনতে শুরু করল। আস্তে আস্তে হাসপাতালে নার্সের কাজও করতে লাগল এক-আধটু। তাতে নার্স ক্ষুব্ধ হলো। এতদিন শানোর প্রতি সহানুভূতি ছিল তার। কিন্তু এখন সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো, কারণ তার মনে আশঙ্কা দেখা দিলো, শানো আবার তার জায়গায় যেন জুড়ে না বসে। সে জন্তে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে বেশ কড়া কথা শোনাতে লাগল।

এখন হাসপাতালের সমস্ত কর্মচারী, আর্দালি চাপরাশী নার্স থেকে সিনিয়র কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত, সবাই শানোর বিরুদ্ধে। কিন্তু শানো সব কিছু উপেক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মধুর হাসিতে আত্মমগ্ন হয়ে দিন দিন স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠতে লাগল।

মা স্বাস্থ্যোদ্ধার করে লাহোর থেকে ফিরে এলেন, সেটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পরেও হয়তো আরও দু' তিন মাস তিনি লাহোরে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কাটাতেন। কিন্তু মোতিরামের চিঠি পেয়ে তিনি চলে আসতে দিশে পাননি। পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছেন। মা ফিরে আসাতে আমি আর বাপী দু'জনেই খুব খুশি। আমি তো আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিলাম। মা-র পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম। তিনি আমায় কোলে তুলে নিয়ে খুব চুমু খেয়ে আদর

করলেন। কিন্তু বাপীর কাছে তিনি বড় গম্ভীর ও নিরাসক্ত হয়ে রইলেন। সে সময় বাপী সেটা মোটেই লক্ষ্য করলেন না। একটু পরে তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন। মা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কথায় কথায় তিনি ঝি-চাকরকে বকাবকা শুরু করলেন। তাঁর ধারণা, তারা তাঁর অনুপস্থিতিতে ঘর-সংসার সব তছনছ করেছে।

রাত্রে ঘুমোবার সময় এটা ওটা কথা বলতে বলতে মা হঠাৎ বাপীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই শান্তি ছুঁড়িটা কে?'

বাপী জিজ্ঞেস করলেন, 'শান্তি কে? শানো?'

'তোমার কাছে শানো-টানো হবে, আমার কাছে মুখপুড়ি শান্তিই। কবে থেকে সে তোমার মনে মধু ঢালছে শুনি? অ্যা?'

'কি যা-তা কথা বলছ কাকার মা?'

'ঠিকই বলছি। আমার কাছে সব খবর আছে। ভগবান মঙ্গল করুন মোতিরামের। তার ঘরে চাঁদের মতো রাজপুত্তুর হোক। তার বৌয়ের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক। ভালোমানুষ, তাই তো সব কিছু লিখে জানিয়েছে আমায়।'

'মোতিরাম?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মোতিরাম। আর মোতিরাম লুকোবেই বা কি, সারা দুনিয়ার লোকেই তো জানে! তোমার ব্যবহারে সারা হাসপাতাল হাসাহাসি করছে, সারা এলাকা ছি-ছি করছে। তোমার কীর্তির খবর রাজদরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

'আমি তো কিছু করিনি!'

'আহা, আমি তো কিছু করিনি!' মা মুখ ভেংচিয়ে বাপীর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'এর আগে এসেছিল সেই হতচ্ছাড়ি বেদেনী, তার আগে এসেছিল ভাতারখাকি করিমন, এখন আবার এই মাথাখাকি শানো কোত্থেকে এল! আমি তোমায় আর কত সামলাব বলো তো! তোমার একটা লজ্জা-শরম হয় না?'

'কারোর চিকিৎসা করতে লজ্জা-শরম কিসের?'

'কারো চুলে ফুল গুঁজে দেওয়াটা চিকিৎসা? কারোর হাতের রান্না খাওয়াটা চিকিৎসা? কারোর কাছে বসে দেড় দু' ঘণ্টা ধরে খোশগল্প করে আসাটা চিকিৎসা? আর এগুলো যদি চিকিৎসা হয়, তাহলে প্রেম-ভালোবাসা কাকে বলে শুনি?'

বাপী গর্জন করে উঠলেন, 'কাকার মা, ভেবে-চিন্তে কথা বলো।'

মা বিছানা থেকে উঠে বসলেন। মাটিতে পা ঠুকে বললেন, 'শুনব না আমি— শুনব না। যতক্ষণ না ওই কালামুখী ওখান থেকে দূর হচ্ছে, ততক্ষণ আমার কথা বন্ধ হবে না।'

'যখন সে সেরে উঠবে, নিজে থেকেই চলে যাবে এখান থেকে।'

মা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কোথায় যাবে ও? যাওয়ার জন্যে এসেছে? ও এখানে

থাকতেই এসেছে। এখন তো নার্সের কাজ শিখছে। এর পর তো ও নার্সের জায়গাটা নিজেই নিয়ে নেবে। তারপর আমার জায়গাটা নিতে ওর আর কতক্ষণ? নিজের স্বামীকে খেয়ে এখানে এসেছে। এখন আমার কপাল পোড়াতে চাইছে। ডাইনী! আমি ওর নাক ছেঁচে দেবো, ওর ঠ্যাঙ দুটো ছিঁড়ে ফেলব। দেখো, আমি সাফ-সাফ বলে দিচ্ছি, এক্ষুনি ওই পেত্নীটাকে এখান থেকে বার করে দাও। নইলে কাল থেকে এ বাড়িতে আমার অন্নজল বন্ধ বলে দিচ্ছি।'

* * *

পরদিন থেকে মা অনশন শুরু করে দিলেন। দিনে দু'বার নুন-মেশানো জল খান। সেটাও আসে মোতিরামের ঘর থেকে। ব্যস্, শুধু ওই। তাছাড়া আর কিছু খান না তিনি। আমি কেঁদে-কেটে সারা হই। মাকে বোঝানোর জন্যে বাপীকে বলি। কিন্তু তিনি তো রাগে সাপের মতো ফোঁসফোঁস করেন। তিনি কিছুতেই শানোকে হাসপাতাল থেকে বার করে দিতে রাজি নন। এই রকম ঝগড়া-কলহে প্রথম দিন কেটে গেলো, দ্বিতীয় দিন কেটে গেলো, তৃতীয় দিনও কাটল। চতুর্থ দিন মাকে বড় শ্রান্ত ও দুর্বল দেখাতে লাগল। তাঁর মুখ দিয়ে ভালো করে কথাও বেরোচ্ছিল না। দীর্ঘ রোগভোগের পর সবে একটু সেরে উঠে লাহোর থেকে ফিরেছেন তিনি, এসেই এ রকম এক দুরবস্থায় পড়লেন।

বাপী রাগে কাউকে কিছু না বলে টেনিসের র‍্যাকেট আর বল নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। বাংলোর পাঁচিলটাকে তাক করে টেনিস খেলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। এমন সময় একটা চাকর এসে মাকে বলল, 'শানো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

মা কোনো জবাব দেওয়ার আগেই শানো মাথা হেঁট করে ভেতরে এসে দাঁড়াল। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ। পরনে কালো পাড়ওয়ালা ময়লা ধুতি। শুকনো ঠোঁট। এগিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে মায়ের চরণ স্পর্শ করল, তারপর বলল, 'আমি তো জন্ম-জন্মান্তরের পাপিনী। নইলে নিজের কপাল পুড়িয়ে এখানে আসতে যাব কেন? তোমার ঘরে আগুনই বা জ্বালাব কেন? কিন্তু এখন আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, আর কখনও এখানে আসব না।'

মা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছোট ঘোমটার আড়ালে তার সাদা ফ্যাকাশে মুখখানির দিকে চেয়ে রইলেন। তার রক্তহীন গণ্ডদেশ, নীরস ওষ্ঠ, নিষ্প্রভ চোখ, সব মিলিয়ে এক অস্পষ্ট ধূসর প্রতিকৃতি —ছবিটি যেন আবার সৌন্দর্যহীন হতে চলেছে।

শানো যেন জোর করে তার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি সোয়েটার বার করল। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এটা আমি ওঁর জন্যে বুনছিলাম। আমার কাছে তো উনি চিরকাল দেবতার চেয়েও বড় হয়ে থাকবেন। যদি মনের মধ্যে একটি মেয়ের ব্যথা-বেদনা কোনোদিন অনুভব করো, তাহলে নিজের হাতে এটা শেষ কোরো। ব্যস্, আমি শুধু তোমার কাছে এইটুকুই চাই।'

কথা ক'টি শেষ করে শানো তার আধ-বোনা সোয়েটার মা-র বিছানার পাশে রেখে দিলো, তারপর যেন সজোরে নিজের ঠোঁট বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাওয়ার সময় অকস্মাৎ দরজার চৌকাঠে ঠোক্কর খেলো এবং তার মাথা থেকে কাপড় সরে গেলো। সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম, তার মাথা মুড়নো। এতক্ষণ পর্যন্ত শানোর কথা শুনে আমার কান্না পায়নি, কিন্তু কেন জানিনে, তার মুড়নো মাথা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।

শানো যাওয়ার পর বাপী বড় চুপচাপ হয়ে গেলেন। খানিকটা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়লেন। এর পর কয়েক মাস পর্যন্ত আমি বাপীর মুখে তাঁর সেই প্রিয় গান একদিনও শুনিনি। যে গান শুনলে মা ভীষণ রেগে যেতেন, এখন সেই গান শোনার জন্যে তিনিও উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে মা কখনো কিছু বলতে গেলে বাপীর মুখ এমন থমথমে হয়ে ওঠে যে, মনের কথা মনেই চেপে রাখেন তিনি। দেখেশুনে মনে হয়, শানোর ব্যাপারে বাপী কোনো কথাই আর শুনতে চান না।

শানোর যাওয়ার প্রায় মাস ছয়েক পরে খবর পাওয়া গেলো যে শানো তার গাঁয়ে ক্ষয় রোগেই মারা গেছে। শানোর ভাশুর কি কাজে এ দিকে এসেছিল। হাসপাতালে এসে ডাক্তারবাবুকে বলে গিয়েছে। সে দিনই সন্ধ্যের দিকে বাপীর এমন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল যে রাতে বাড়তে বাড়তে একশো পাঁচ ডিগ্রিতে উঠল। মা রাতভর বসে বসে সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু পরদিনও জ্বর কমল না। পরে জানা গেলো, টাইফয়েড। পুরো একুশ দিন পরে জ্বর ছাড়ল। বাপীর শরীর তখন একেবারে শীর্ণজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যেন চামড়ায় মোড়া হাড়ের কঙ্কাল। যকৃতের দোষ দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটো হলদে হয়ে গিয়েছিল জণ্ডিসের তীব্র আক্রমণে।

দিন নেই রাত নেই, মা এক নাগাড়ে বাপীর সেবা-শুশ্রূষা করে চলেছেন। দেখে মনে হচ্ছিল, মা বাপীর খাটেরই যেন একটা অংশ। মা-র নিজেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। নিজের প্রাণ দিয়ে তিনি যেন বাপীকে সারিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

রাজাসাহেব ডাক্তারবাবুর প্রতি বড় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। সে জন্যে তিনি তাঁর চিকিৎসার জন্যে অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিলেন। নতুন ডাক্তার হাসপাতালে কাজ করা ছাড়াও দিন-রাত বাপীকে দেখাশোনা করেন। নার্সও অনেকখানি সময় কাটান বাপীর কাছে। বিশেষ করে বাপীর জন্যেই লাহোর থেকে অনেক ওষুধপত্র আনানো হলো। কিন্তু বাপীর জণ্ডিসের প্রকোপ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে, ক্রমশ তিনি শীর্ণকায় হয়ে পড়ছেন।

মা ঝাড়-ফুঁক কবচ-মাদুলি তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই বাকী রাখলেন না। হাকিম শামসুদ্দিনের ইউনানী দাওয়াই নিয়ে এসেও বাপীকে খাওয়ালেন। বৈদ্য শিবরামের পাচন ও জড়িবুটিও পরীক্ষা করে দেখলেন। নতুন ডাক্তার গিরিধারীলালও সব

রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাপীর স্বাস্থ্য কিছুতেই ফিরছে না। বরং দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর পাঁজরাকাঠিগুলো বেরিয়ে এসেছে। অমন সুন্দর চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খানাখন্দের নোংরা জলের মতো ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

বাপীর সেবাযত্নে মা-র দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটে। বাকী সময় কাটে পুজোপাটে। মাঝে মাঝে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কিন্তু বাপীর সামনে আমি তাঁকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। সব সময় মুখে একটা হাসি-খুশি ভাব বজায় রাখেন। ঠিক সময় খাওয়ান, ওষুধ দেন। দরকার হলে পা টেপেন। রাতে পাশ ফেরার সময় বাপী যখনই জাগেন, দেখতে পান, মা তাঁর পায়ের কাছে জেগে বসে আছেন। মা যে কখন ঘুমান আর কখন জাগেন, কেউ জানে না। বাপী সব দেখেন, কিন্তু কিছুই বলেন না। সেই তাঁর নিষ্প্রাণ চেহারা, হলদে হলদে নিষ্প্রভ চোখ, শুকনো ঠোঁট, আর কাঁপতে থাকা হাতের আঙুল। দিনে তো তাঁর মোটেই ঘুম হয় না, রাতেও ঘুমোন খুব অল্প। লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না, বেশীর ভাগ সময় ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকেন। দেখেশুনে মনে হয়, তাঁর মনের মধ্যে বাঁচার ইচ্ছেটা যেন মরে গেছে, অসুখের কাছেই যেন নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিয়েছেন।

ডাক্তার গিরিধারীলাল ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। বাড়িতে নৈরাশ্যের ঘন ছায়া নেমে আসছে। চলতে ফিরতে কিংবা কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়, যেন মৃত্যুর পদশব্দ কানে আসে। রাত্রে দূর থেকে কোনো কুকুরের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলে মা-র বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে, দোপাট্টায় মুখ ঢেকে এমনভাবে নীরবে কাঁদতে থাকেন যে, দেখে মনে হয়, ভয়ে ও যন্ত্রণায় যেন তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। চিৎকার করে মাথা চাপড়ে কান্নাকাটি করলে মন হাল্‌কা হয়, কিন্তু এইভাবে চুপিচুপি কাঁদলে অন্তরে ঘা লাগে এবং তাতে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

এই সময় এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমাদের বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়ালেন ভিক্ষে করতে। তাঁর এক হাতে চিমটে, অন্য হাতে ত্রিশূল। কাঁধে একটা বড় পুঁটলি ঝুলছে। মা তাঁর ঝুলিতে অনেক আটা দিলেন, ডাল দিলেন। তারপর নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন তাঁকে। তখন মায়ের অবস্থা এমনই যে পারলে তিনি গাছের কাছেও নিজের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি প্রত্যেককেই বাপীর অসুখের কথা বলতেন। আর নতুন কোনো ওষুধ বা জড়িবুটির নাম শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন।

সন্ন্যাসী সব শুনে বললেন, 'আমি ব্যাটাকে দেখব একবার। আমার কাছে কিছু কিছু জড়িবুটি আছে, তা দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, তাহলে মহাদেব কল্যাণ করবেন।'

সন্ন্যাসী বাপীর হাতের আঙুল ও নখ দেখলেন, পায়ের নখ দেখলেন। মাথা, চোখ ও কানের শক্তি দেখলেন। তারপর বাপীকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে মাথা নেড়ে মাকে বললেন, 'ওর অসুখ আমার নাগালের বাইরে।'

মা হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে সন্ন্যাসীর পায়ে পড়লেন। তারপর অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিছু একটা করুন সাধুবাবা।'

'না বেটি, ওর ব্যাধি আমার নাগালের মধ্যে নয়। একমাত্র ভগবানই ওকে বাঁচাতে পারেন। আমি তো ওর চোখে যমদূতকে লক্ষ্য করলাম।'

মা সটান উঠে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বললেন, 'যমদূত ? যমদূত এসেছে, তো ঠিক আছে। আমিও ক্ষত্রিয়াণী। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি —আমি বেঁচে থাকতে যদি মৃত্যু হাত বাড়ায় তবে যমদূতের পা দুটো ধরে চিরে ফেলব।'

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মৃত্যুকে কি করে ঠেকাবে বেটি ?'

'ওঁর মরার আগে আমি নিজের প্রাণ দেবো। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে মৃত্যু ওঁকে ছুঁতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞাই করেছি আমি।' মা-র চেহারা প্রচণ্ড রাগে, সুকঠিন আত্মপ্রত্যয়ে আরক্ত হয়ে উঠল। এর আগে মাকে এমন মহিমাময়ী-রূপে আর কখনও দেখিনি।

সন্ন্যাসী তাঁকে দেখে হাসলেন। বললেন, 'আমি তোর মনের জোর দেখতে চাইছিলাম বেটি। অবশ্য এ রোগের একটা ওষুধ আছে। কিন্তু তা এমনই দুঃসাধ্য যে যথেষ্ট ধৈর্য ও সুদৃঢ় মনোবলের দরকার।'

মা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আপনি বলুন না সাধুবাবা। সে ওষুধের জন্যে দরকার হলে আমি আমার সমস্ত গয়না বিক্রি করে দেবো। দরকার হলে আমি নিজের প্রাণ দেবো।'

'তার জন্যে এক পয়সাও খরচ হবে না। তবে হ্যাঁ, খুব কঠিন কাজ। তবু তোমার মনের জোর দেখেই সেটা বলছি তোমায়। জঙ্গলে এক রকমের লতা জন্মায়, লোকে তাকে ফকানো লতা বলে। কখনো কখনো মাঠেঘাটেও পাওয়া যায়। কিন্তু জঙ্গলেই সাধারণত বেশী হয়ে থাকে। প্রত্যেক চাষীই চেনে লতাটা। ওতে এক রকমের ফল হয়; তাকে ফকানো বলে। টম্যাটো থেকে ছোট, কিন্তু দেখতে অনেকটা শসার মতো। এক ধরনের টক-মিষ্টি স্বাদ।'

মা খুব আশান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ফকানো আমি মাঠে দেখেছি। ছেলেপিলেরা খুব মজা করে খায়।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হ্যাঁ, ওই জিনিসই। কিন্তু আজকাল মাঠে পাওয়া যায় না। জঙ্গলে পাবে, কিন্তু সেখানেও খুব ঢালু জায়গায়, যেখানে রোদ আসে না। কারণ এ গাছ খুব ঠাণ্ডা জায়গায় জন্মায়। এ ব্যাপারটা তুমি আবার অন্য কাউকে ছেড়ে দিও না। খুব ভোরে উঠে তোমায় নিজেকে জঙ্গলে যেতে হবে। ভোরবেলা

ফফানো ফলে যে শিশির থাকে, একটা থালায় তা সংগ্রহ করতে হবে, সেই সঙ্গে ফফানোগুলোও আলাদা তুলে রাখতে হবে। সূর্য ওঠার আগেই শিশিরের জল তোমার স্বামীকে খাইয়ে দেবে। আধ ঘন্টা বাদে ফফানোর রস বার করে বীজগুলো ফেলে দিয়ে খাওয়াবে। কিন্তু সমস্ত কাজই সারতে হবে সূর্য ওঠার আগে। চল্লিশ দিন যদি এ ওষুধ খাওয়াতে পার, তাহলে জেনে রাখো, প্রভুর কৃপায় তোমার স্বামী সেরে উঠবে।'

মা সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করলেন। তারপর দশ টাকা প্রণামী দিলেন তাঁকে। কিন্তু সন্ন্যাসী টাকা নিতে অস্বীকার করলেন।

'আজকের দু'বেলার খাবার তোমার ঘর থেকে পেয়ে গেছি। ব্যস্, এর চেয়ে বেশী কিছু নেওয়ার অনুমতি নেই। আমি এখন আসি।' সন্ন্যাসী চিম্‌টে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন।

পর দিন মা ভোরের আলো না ফুটতেই আমাদের এক চাকর কৃপারামকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেলেন। আবার চারদিক ভালো করে উজ্জ্বল হওয়ার আগেই একটা মুখ-ঢাকা কাঁসার পাত্রে শিশিরের জল আর ফফানো ফল সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি এত সাবধানী যে ডাক্তার গিরিধারীলালের মত না নিয়ে কোনো ওষুধ ব্যবহার করতেন না। তখনই ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। বেচারা তখনো ঘুমোচ্ছিলেন। মা-র ডাক পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন। সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসায় তাঁর মেজাজ তিতিবিরক্ত। কিন্তু ফফানো ফলগুলো দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন একেবারে। বললেন, 'এগুলো ফফানো ফল, তাই না? ছেলেপিলেরা ছাগল ভেড়া চরাতে চরাতে জঙ্গল থেকে তুলে খায়!'

মা বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, 'সেটা তো আমিও জানি। আপনার কাছ থেকে শুধু জানতে চাওয়া যে, এর রস খাওয়ালে কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

গিরিধারীলাল ক্ষিপ্ত মেজাজে বললেন, 'ক্ষতি না-হয় না হলো, কিন্তু লাভটাই বা কি হবে? খাইয়ে দেখুন।'

'আপনি যদি বলেন··· !'

কিন্তু গিরিধারীলাল বাপীর অবস্থা সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাই মা-র ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন সব কিছু। বাপীকে দেখতেন তিনি, ওষুধপত্রও দিতেন, কিন্তু তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না যে বাপী সেরে উঠবেন।

মা বাপীকে দু' ঢোক শিশিরের জল খাওয়ালেন। তার আধ ঘন্টা পরে বীজ ফেলে দিয়ে ফফানোর রস খাওয়ালেন। তারও ঘন্টাখানেক পরে সূর্য উঠল। মা নিশ্চিন্ত হলেন।

বাংলোর পেছনে রেলিং-এর কাছে এক পাথরের ওপর বসে বসে কৃপারাম ছুঁচ দিয়ে তার পায়ের কাঁটা বার করছিল আর আপন মনে গজগজ করছিল, 'ইস্, কি কাঁটায় ভরা জঙ্গল! আর ফফানোগুলোও হয় এমন গড়ানে জায়গায়! যেখানে

সেখানে তো পাওয়াই যায় না। এমন জায়গায় রয়েছে, হয় সেটা গর্ত, নইলে খাড়াইয়ের গড়ান, আর না-হয় ইয়া বড় বড় পাথরের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে, একটা ছাগলও ঢুকতে পারে না সেখানে! আমার পা দু'খানা তো গেছে, পায়জামাটাও ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার। আর কি রকম ঠাণ্ডা, গায়ে কম্বল জড়িয়ে গিয়েও রাস্তায় দাঁতে দাঁত ঠুকে যায়। আর তোর মা? বাঘিনী, কাকা, বাঘিনী! জঙ্গলে ভয়-ডর নেই একটু! এই পাথরে উঠছে তো ওই গর্তে নামছে! আমি তো সে সব জায়গায় যেতেই পারিনি। আর তোর মা, আছাড় খেয়ে হামা দিয়ে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছে যাচ্ছে। দোহাই বাবা, চল্লিশ দিন সঙ্গে যাওয়ার সাধ্যি নেই আমার। তোর মা-র মাথায় তো খুন চড়েছে! আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। চাকরি ছেড়ে দেবো, সেও ভালো।'

সে তো ওইভাবে বকেই চলল। কিন্তু পর দিনও গেলো সে। তৃতীয় দিনও গেলো, চতুর্থ দিনেও গেলো। কিন্তু পঞ্চম দিনে সাহস হারিয়ে ফেলল একেবারে। সে দিন গেলো জগৎ সিং। সেও পাঁচ দিন গেলো। শেষ পর্যন্ত হারতে হলো তাকেও। তারপর থেকে মা আর্দালি ফিরোজকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এত দিন মা ভোরের আলো ফোটার আগেই চাকরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন। সূর্য ওঠার আধ ঘণ্টা আগে, কখনো বা এক ঘণ্টা আগে ফিরে আসতেন। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সূর্য ওঠার আগেই তিনি বাপীকে শিশিরের জল আর ফফানোর রস খাইয়ে দিতেন। চাকরেরা কয়েকবার বলেছিল, 'আপনার যাওয়ার কি দরকার মা-ঠাকরুন, আমরাই জঙ্গল থেকে ফফানো আর তার শিশিরের জল এনে দেবো।'

কিন্তু মা হাত নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'যদি তোমরা কোনো দিন আনতে না পারো? কিংবা কোনো দিন আলসেমি করে শিশিরের জলের বদলে দু' ঢোক নদীর জল এনে দাও, তখন কি হবে? না বাবা, এ ব্যাপারে পর-ভরসা করব না আমি।'

কিন্তু একদিন মা-র জঙ্গল থেকে ফিরতে অনেক দেরি হতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেলো, তবু মা এলেন না, ফিরোজও এল না। বাড়িতে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। সূর্য উঁকি দিলো, ক্রমশ পাহাড় ছাড়িয়ে সূর্য ওপরে উঠল, তবু মা ফিরলেন না। বাপী দু' একবার দরজার দিকে চাইলেন, তারপর আবার ছাদের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

সূর্যটা যখন হাত চারেক ওপরে উঠেছে, তখন চাকর-বাকরদের মুখ-চোখে আশঙ্কা দেখা দিলো। নিজেদের মধ্যে ফুসুর-ফুসুর করতে লাগল তারা। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রয়েছি, পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত কি-না ভাবছি, এমন সময় দূরে গাছপালার আড়ালে ফিরোজকে আসতে দেখা গেলো। মাকে কাঁধে নিয়ে হেঁটে আসছে সে।

ফিরোজের দিকে সবাই দৌড়ে গেলো। আমিও কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলাম। ক্ষত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো ফিরোজের কোমর ধরে গিয়েছিল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। মজিদ আর কৃপারাম ফিরোজের কাঁধ থেকে মাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে আনল। আমি লক্ষ্য করলাম, মা-র শাড়ি জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, হাত-পা থেকে রক্ত ঝরছে, চোখ বন্ধ। চেহারায় যেন প্রাণের চিহ্ন নেই একটুও। আমি জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলাম।

মজিদ আর কৃপারাম বাপীর সামনে অন্য একটা খাটে মাকে শুইয়ে দিলো। বাপী আমার কান্না শুনে ছাদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে ?'

বুড়ো ফিরোজ বলল, 'মা খাদে পড়ে গিয়েছিলেন সাহেব। মারাত্মক ঢালু খাদ। যেমন পিছল, তেমনই গর্ত আর অন্ধকার। খুব নীচে একটা ফকানোর লতা ছিল, তাতে পাঁচ-ছটা ফকানো ধরে ছিল। আজ জঙ্গলে ফকানো বেশী পাওয়া যায়নি। আমি মাকে কত বোঝালাম, কিন্তু কিছুতেই কথা শোনেন না। হুজুর, আমি বুড়ো হয়েছি, খাদে নামতে সাহস হলো না। কিন্তু মা আমার নিষেধ মানলেন না, খাদে নামতে শুরু করে দিলেন। তারপর নামতে নামতে পা পিছলে··· হুজুর, বুঝলেন কি-না, কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিন্তু জোর চোট লেগেছে হুজুর।'

বাপী কোনো রকমে বিছানা থেকে উঠে মা-র খাটের কাছে এলেন। মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন। আলুলায়িত চুল। চুলে তেলও দেননি, চিরুনিও ছোঁয়াননি। কপালে রক্তের দাগ। মলিন গণ্ডদেশ, দুঃখ-তাপে বিবর্ণ। শীর্ণ বাহু দুটিতে আঁচড়ের দাগ ও আঘাতের নীল চিহ্ন। পা থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। তাঁকে এমন দুর্বল, শীর্ণকায় ও নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল যে তাঁকে দেখলে, পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও মন করুণার্দ্র হয়ে উঠবে।

বাপী মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'জানকী ! জানকী !'

মা-র শরীর তেমনি নিস্তেজ, নিস্পন্দ।

হঠাৎ বাপী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে মা-র সেই নিস্তেজ শরীরটাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি তোমার ওপর খুব অত্যাচার করেছি জানকী। আমায় ক্ষমা করো —আমায় ক্ষমা করো ···আমি দিব্যি গিলে বলছি, আর কক্ষনো না··· আর কক্ষনো না··· !!'

স্বামীর কোলে শুয়ে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। কাঁপা কাঁপা আঙুলে স্বামীর ক'দিনের না-কামানো দাড়ি ছুঁয়ে বললেন, 'না, দোষ তো আমার। আমাকেই ক্ষমা করো তুমি। আমি ভেবেছিলাম, শানোকে ভালোবেসেছিলে তুমি। কিন্তু তুমি যে শুধু তাকে জীবন দান করছিলে, সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল আমার। যখন বুঝলাম, তখন সে মারা গেছে। তার মৃত্যুর জন্যে তোমার যে দুঃখ, তার জন্যে আমিই দায়ী। যে পাপিষ্ঠা, সে-ই ক্ষমা চাইছে···'

মা নিজের চোখের জলে নিজেই লজ্জা পেলেন। ঝি-চাকরেরা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাপী এক হাতে আমার, অন্য হাতে মা-র গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পুরনো কথা ভুলে যাও জানকী। আর কক্ষনো না ব্যস্, আর কক্ষনো না। এমন আর হবে না কখনও। আজ থেকে আমার মন যেভাবে সমর্পণ করলাম তোমার কাছে, এ পর্যন্ত কখনও তা করিনি। ব্যস্, এখন আর তো বাকী রইল না কিছু!'

মা লজ্জা ও খুশিতে বাপীর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাপীও কাঁদছেন। অতএব আমিও কেঁদে ফেললাম। কারণ আমরা ভারতীয়রা একটা ছিচ্‌কাঁদুনে জাতি। আমাদের চোখে প্রচুর জল। যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময় আমরা কাঁদতে পারি। অন্যেরা এটাকে আমাদের দুর্বলতার পরিচয় মনে করে ভুল বোঝে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? এখনো আমাদের মনের সংবেদন-শীলতা ও চোখের জল তো শুকিয়ে যায়নি! অবশ্য এটা ঠিক যে, আমরা যখন আরও সভ্য-ভব্য হয়ে উঠব, তখন চোখের জলকে ঘৃণা করব।

* * *

দুপুরবেলা মা নিজের খাটে বসে বসে কিছু সুতোর জট ছাড়াচ্ছিলেন। গিরিধারী-লাল বাপীর খাটের কাছে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। আর বাপী খাটের ওপর বড় বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মৌজ করে বসে আছেন আর আস্তে আস্তে গুনগুন করছেন—

বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে—
কুঞ্জবনে —কুঞ্জবনে —বাঁশি যখন···

গিরিধারীলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোন ওষুধটা শুরু করব?'

বাপী হেসে বললেন, 'এখন যদি নদীর জল এনে খাওয়ান, তাতেও সেরে উঠব।' তাঁর চোখে-মুখে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি।

ডাক্তার গিরিধারীলাল বিস্ময়ে বাপীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মা মাথা হেঁট করে সুতোর জট ছাড়াতে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যেন।

বাপী মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে ওটা কি?'

মা নিজের খাট থেকেই তাঁর হাতে জড়ানো উল বাপীকে দেখিয়ে বললেন, 'ভাবছি, শানোর সেই সোয়েটারটা এ বার শেষ করে ফেলি।'

বাপী ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে সেই অসম্পূর্ণ সোয়েটারখানি নিজের হাতে নিলেন। সোয়েটারের ওপর আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওটা এখন শেষ করে ফেলো।' কিন্তু তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে আনন্দ কিংবা বিষাদ কিছুই ছিল না। ছিল কোনো এক মনোমুগ্ধকর স্মৃতির কণ্ঠস্বর যেন।

আট

একদিন আমি মা-র ঘরে যাচ্ছি বল নিতে। দরজার কাছে যেতেই শুনি, মা বলছেন, 'সরো। আমায় ছুঁয়ো না।'

'কেন ছোবো না?' বাপীর গলা।

'আজ সংক্রান্তি।'

'সংক্রান্তি তো কি হলো?'

'সংক্রান্তিতে ছুঁতে নেই।'

'তাহলে কাল?'

'কাল! কাল তো বামন অবতারের তিথি।'

'আচ্ছা, তবে পরশু?'

'উঁ! পরশু? পরশু শাহ্ মুরাদের মাজারে শিন্নি দেওয়ার দিন। ভুলে গেলে? মাজারে শিন্নি দিতে তো তোমাকেও যেতে হবে! মিয়াঁ রমজানি বলছিলেন, ডাক্তারবাবু কখনও মাজারে আসেন না কেন? এই, সরো সরো··· সরো বলছি। ছুঁয়ে দিলে আবার চান করতে হবে আমায়।'

একটু পরেই বাপী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিতিবিরক্ত হয়ে মুখ ভার করে। কপাল ভালো যে, আমি দরজার আড়ালে ছিলাম। নইলে ঠিক রেগে যেতেন আমার ওপর। ছেলেরা বড়দের কথায় কান দিলে বাপী মা দু'জনেই রেগে যান। কেন তাঁরা এ রকম করেন, সেটা আমার কিছুতেই মাথায় আসে না। বড়রা তো আমাদের সব কথা শোনেন! সামান্য ব্যাপারেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কি জিজ্ঞেস করেন! আর আমরা কখনো তাঁদের দু'একটা কথা শুনে ফেললেই হৈ-হৈ করে ওঠেন! যেন তাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলো আর কি!

বাপী বেরিয়ে যেতেই আমি ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। গিয়েই মা-র পা দুটো জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাঃ বাঃ, কি মজা! আমি ছুঁয়ে ফেলেছি—ছুঁয়ে ফেলেছি—ছুঁয়ে ফেলেছি!'

ভেবেছিলাম, মা রেগে যাবেন, বিরক্ত হয়ে বকাঝকা করবেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছুই করলেন না। মৃদু হেসে বুকে কাপড় টেনে দিয়ে কোলে তুলে নিলেন আমায়। আদর করতে করতে বললেন, 'কাকা, তুমি জলখাবার খেয়েছ।'

'হ্যাঁ, মা।'

'আর লাল সিরাপটা?'

'হ্যাঁ মা।'

মা আমার দুই গালে চুমু খেলেন। তারপর কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে যাও এখন। বাইরে বাগানে গিয়ে খেলোগে।'

সে সময় মাকে দেখে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছিল। তাই ভাবলাম, এই সুযোগ। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, একটা কথা বলবে?'

মা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বলব।'

'আমি তোমায় ছুঁয়ে দিলাম, তুমি কিছু বললে না যে? বাপী তোমায় ছুঁতে চাইছিল, আর তুমি শুধু 'সরো সরো' বলছিলে কেন?'

মা-র হাসি-খুশি মুখখানা মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার কথা শুনে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। আমার দু' হাতে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন, 'তুমি আমাদের কথা শুনছিলে? দুষ্টু! বজ্জাত!'

আমি ভয় পেয়ে গেলাম ভীষণ। মা রেগে গেলেই আমায় এমনি ঝাঁকানি দিতে থাকেন, ঠিক যেমন বাপী ওষুধ খাওয়াবার সময় শিশিটাকে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে নেন, তেমনি। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্বীকার করে ফেললাম। বললাম, 'হ্যাঁ মা, আমি দরজার কাছে ছিলাম। কিন্তু আমি তো শুনিনি, আপনা থেকেই আমার কানে এসে গেলো। আমি তো বল নিতে…'

কিন্তু মা আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। ঠাশ-ঠাশ করে চড় বসিয়ে দিলেন আমার গালে। বললেন, 'তোকে পঞ্চাশবার বলেছি, বড়দের কথা শুনবিনে —শুনবিনে —শুনবিনে। তবু কথা মনে থাকে না? অ্যাঁ? (এক চড়) অ্যাঁ? (দ্বিতীয় চড) অ্যাঁ? (তৃতীয় চড়) আস্ত বাঁদর…!'

যদি ঠিক সেই সময় বাড়ির একজন ঝি বেগম দৌড়তে দৌড়তে না আসত, তাহলে আমার ওপর আরও কত যে চড়-চাপড় পড়ত —ভাবতেই পারিনে। সে এসে জোর-জবরদস্তি করে মা-র হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল আমায়। বলল, 'ওকে মেরে ফেলবেন না-কি? আপনি রাগে এমন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মা-ঠাকরুন, আগুপিছু খেয়াল থাকে না আপনার!'

বেগম আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলো। মুখ ধুইয়ে দিয়ে আমার মুখে চুমু খেলো। আমায় তার নরম তুলতুলে বুকে তুলে নিয়ে আদর করল। তারপর আমার ফোঁপানো কান্না বন্ধ হলে সে আমায় নিয়ে গেলো বাংলোর পেছন দিকে। সেখানে আমাদের পোষা পায়রার খোপ রয়েছে। সেখান থেকে সে একটা পায়রা ধরে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, এটাকে নিয়ে খেলা করো এখন।' বলে সেখানে আমায় ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে চলে গেলো।

আমি তো পায়রাটাকে নিয়ে খেললাম কিছুক্ষণ। তারপর একটা বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে। কতক্ষণ ধরে খেলেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হলো, বাংলোর পেছনে যে কাঠের বেড়াটা রয়েছে, সেখান থেকে কে যেন ডাগর ডাগর চোখ মেলে চেয়ে দেখছে আমায়। আমি ভালো করে চোখ তুলে তাকালাম তার দিকে।

মেয়েটি ভীষণ সুন্দরী। তামাটে রঙ। গাঢ় নীল চোখ। একরাশ আলুলায়িত কেশ। পরনে একটি আঁটসাট লাল রেশমী কামিজ। সেই আঁটসাট কামিজ ঠেলে তার উন্নত বুক বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই বুকের ওপর ঝুলছে রুপোর ছড়া আর রঙ-বেরঙের মালা। তার কানে বড় বড় রুপোর রিং। সে যখন আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল, তখন তার ছোট ছোট দাঁত চোখে পড়ল। বেজায় সাদা। আমার দাঁতগুলোও অতটা সাদা নয়, যদিও মা আমায় দিনে দু'বার করে ব্রাশ করিয়ে দেন।

লাল রেশমী কামিজের নীচে সে একটা চওড়া ঘেরওয়ালা ঘাগ্‌রা পরে আছে। তাতে নানা রঙের নানা রকমের কাপড়। কিন্তু তার পায়ে জুতো নেই, খালি পা। কাঁধ থেকে ঝুলছে দুটো ঝাঁপি।

সে আমার দিকে চেয়ে হাসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে ?'

বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বাঁ পা দিয়ে ডান পা-টা চুলকে নিয়ে বলল, 'আমি বেদেনী। আমার কাছে অনেক ভালো ভালো সাপ আছে, দেখবে ?'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, দেখব।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতাশ গলায় বললাম, 'কিন্তু তোমার কাছে বাঁশি নেই তো !'

'আছে। থাকবে না কেন ?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেদেনী বলল। তারপর তার পিঠের দিকে ঝুলনো বাঁশিটা সামনে এনে দেখাল, 'এই দেখো।'

আমি আনন্দে বলে উঠলাম, 'আগে আমায় বাঁশি বাজিয়ে শোনাও।'

'উঁহু। আমায় এক আনা পয়সা দাও আগে !'

আমার মন একেবারে ভেঙে পড়ল। বললাম, 'আমার কাছে এক আনা পয়সা নেই যে !'

'তাহলে মা-র কাছ থেকে চেয়ে আনো।'

'মা দেবে না। সাপও দেখতে দেবে না আমায়। মা সাপকে ভীষণ ভয় পায় যে !'

'তাহলে তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এস।' বেদেনী আমায় পরামর্শ দিলো।

আনন্দে আমার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক লাফে বেড়া টপকে বেদেনীর কাছে গিয়ে বললাম, 'চলো। আমি বাপীর কাছ থেকে এক আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে দিচ্ছি তোমায়।'

বেদেনীর আগে আগে বাগানের গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুটে চললাম আমি। রাস্তায় বাপীকে পেয়ে গেলাম। হাসপাতাল থেকে ফিরছিলেন। গোয়াল ঘরের কাছে বসে তিনি মালীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মৌরীগাছের গোড়ায় খুরপি চালাচ্ছিল মালী। মৌরীগাছগুলো বেশ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে, প্রায় আমার দ্বিগুণ। গাছগুলোর ও দিকে ছিলেন বাপী, এ দিক দিয়ে আমাদের আসাটা তাঁর চোখে

পড়েনি। তিনি শুধু দেখতে পেয়েছিলেন, মাথায় একরাশ আলুথালু চুল ও নীল চোখ বিশিষ্ট একখানি মুখ সামনে এগিয়ে আসছে, মৌরীর সুরক্ষিত শীষগুলো দুলে দুলে যেন আবাহন জানাচ্ছে তাকে। দেখেই বাপী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

'আমি বেদেনী।'

'ওটা তো পুরুষের কাজ!'

'আমার বাপ বেদে ছিল। ও মারা যাওয়াতে আমিই এখন এ কাজ করছি।'

'কেন, তোমার কোনো ভাই নেই?'

'না, শুধু এক অন্ধ মা রয়েছে। খুব বয়েস হয়েছে তার।'

ওরা দু'জন পরস্পরকে খুব নিবিড় চোখে দেখছিল। বেদেনীটা হয়তো আমার কথা বেমালুম ভুলেই গেছে! আগে থেকেই আমার কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার এবং আমিও যে এখানে উপস্থিত রয়েছি, চিৎকার করে সেটা জানিয়ে দেওয়া উচিত। কথাটা ভাবছিলাম, কিন্তু বড়দের কথাবার্তার মধ্যে ছেলেপিলেদের মাথা গলানো উচিত নয়, বিশেষ করে এই একটু আগে মা-র কাছে মার খেয়ে এসেছি, সে কথা মনে পড়তেই নিজেকে সংযত করলাম। তাছাড়া বড়দের কথা-বার্তায় আমার প্রয়োজনটাই বা কি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাপী মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সাপ ধরো?'

বেদেনী নির্ভয় চোখে বাপীর দিকে চেয়ে নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বাপী চঞ্চল চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'গোখরো সাপও?'

বেদেনী হেসে বলল, 'তা-বড় তা-বড় গোখরোও আমার বাঁশি শুনে লুকিয়ে থাকতে পারে না। পাগল হয়ে আমার বাঁশির সামনে এসে মাথা দোলায়।'

'আমাদের বাগানে প্রচুর সাপ আছে। ধরতে পারবে সব?'

'সব ধরব। আমায় কি দেবেন?'

বাপী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'যদি তোমায় কিছু না দিই?'

বাপীকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল বেদেনী। সে একেবারে বাপীর কাছে চলে গেলো। খর নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। বাপীকে হয়তো কিছু বলত, কিন্তু তাঁর নির্ভীক চোখের কঠিনতা ও লাবণ্যময় চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেলো খানিকটা। সে চোখ নামিয়ে নিল। আস্তে আস্তে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা!'

সে যেভাবে 'আচ্ছা' বলল, শুনে খুব খারাপ লাগল আমার। মনে হলো, তার গলার আওয়াজ যেন কাঁদছে কিংবা কাতরাচ্ছে। যেন বাগানে কোনো হাওয়া দূর থেকে এসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার চলে গেলো। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আমাদের বাগানে ঠিক এমনি হাওয়া কাঁদছে বলে মনে হয়। আমি মালীকে কয়েক বার জিজ্ঞেস করেছি এ ব্যাপারে। কিন্তু সে সব সময় আমার কথা উড়িয়ে

কের। বলে, 'ওটা তোমার ধারণা, কাকা। হাওয়া তো হাওয়াই। কাঁদেও না, গানও গায় না। শুধু গাছের পাতা নাড়িয়ে দিয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।'

কিন্তু জানি না, হাওয়া এখন কাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, কাঁপিয়ে দিচ্ছে!

বাপী বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'আজকেই এখানে এসেছি। এখনো কোথাও আস্তানা গাড়িনি। মাকে এই কাছের গাঁ-খানায় রেখে এসেছি।'

'তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও, পুরুষ মানুষকে ভয় করে না তোমার?'

'সাপ রয়েছে আমার কাছে, ওরাই পাহারা দেয় আমায়। আমার তো ভয় করেই না, বরং আমায় দেখে পুরুষেরাই ভয় পায়।'

'আমাদের এখানে বাগানে একটা গোখরো আছে। সে কাউকে ভয় পায় না।' বাপী তার চোখে চোখ রেখে বললেন।

'কোথায় থাকে সে? ওর গর্তটা একবার দেখিয়ে দিন না আমায়! নইলে কোথায় থাকে, সে জায়গাটা শুধু বলে দিন। আমি ধরে ফেলব তাকে। আমার বাঁশিতে এমন যাদু আছে যে বড় বড় সাপেরও রেহাই নেই।'

'আমি মালীকে বলে দিচ্ছি, সে তার বাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের বাগানে যদ্দিন সাপ ধরবে, ততদিন ওখানেই থাকবে। এক একটা সাপ ধরার জন্যে আমি তোমায় আট আনা করে দেবো। কিন্তু সাবধান, বাগানে যে গোখরোর গর্ত রয়েছে, ওখানে যাবে না। ও সাপে যদি কাটে, তবে তার বিষের মন্ত্র নেই।'

'যান যান!' বেদেনী তার ছোট্ট জিভ বার করে বাপীকে মুখ ভেংচাল। তারপর নিজের বাঁশিটা সামনে দোলাতে দোলাতে বলল, 'বলুন না কোন দিকে থাকে আপনার সেই গোখরো?'

'এস, তোমায় দেখাচ্ছি।'

বাপী না-হয় জানতেন না যে আমি মৌরীর গাছগুলোর এ পাশে বেদেনীর কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু বেদেনী কেন ভুলে গেলো আমায়! সে আমার দিকে আদৌ খেয়াল না করে বাপীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। আমিও তাদের পেছনে পেছনে, বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে, গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চললাম।

চেরী গাছগুলো পেরিয়ে ওরা আঙুর ঝোপে পৌঁছলো। সেটা পেরিয়ে আখরোট গাছগুলোর কাছে একটা ছোট্ট টিলায় গিয়ে থামল ওরা। বাপী বললেন, 'এখানেই সেই গোখরোটা থাকে।'

বেদেনী জিজ্ঞেস করল, 'এই ডাঙার মধ্যে?'

'হ্যাঁ। আর লোকে বলে, এই ডাঙাতেই না-কি সঈদা বী-র কবর আছে।'

'সঈদা বী কে?'

'সঈদা বী কে, সেটা কেউ জানে না। তবে সে না-কি খুব সুন্দরী ছিল।

এ সব অনেক দিন আগেকার কথা। তখন এখানে এই বাগান ছিল না, হাসপাতাল ছিল না। রাজাসাহেব ছিলেন না, রাজবাড়িও ছিল না। সেই সময় একদিন মোগল বাদশার এক কাফেলা যায় এ দিক দিয়ে। আর সঈদা বী একজন মোগল শাহাজাদার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। শাহাজাদা বাপের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছিল। সইদা বী-র বাড়িতে দু' মাস ছিল।'

'তারপর ?'

'কয়েক মাস পরে শাহী দরবার থেকে শাহাজাদার নামে বার্তা এল। বাদশাহ্ তাকে ক্ষমা করেছেন এবং ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'তারপর ?'

'তারপর, শাহাজাদা চলে গেলো। সঈদা বী-কে বলে গেলো, রাজধানীতে পৌঁছে সে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাবে। সে-ই আশায় প্রতীক্ষা করতে করতে সারা জীবন কেটে যায় সঈদা বী-র। ...শেষ পর্যন্ত এখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়।'

বেদেনী কিছু বলল না। সে তার কাঁধ থেকে ঝাঁপি নামিয়ে রেখে বসে পড়ল সেখানে। তারপর চোখ বন্ধ করে বাঁশি বাজাতে শুরু করল।

সত্যিই বাঁশির এমন মোহিনী সুরধ্বনি যে বাঁশি যেন কাঁদছে, কেঁদে কেঁদে কাউকে ডাকছে। সে-বাঁশি যেন ক্ষত-বিক্ষত, জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণের জন্য মলম চাইছে। সে যেন এক পথ-হারানো শিশু, পথের কথা জিজ্ঞেস করছে, 'কোথায় ? কোন দিকে ?'

বেদেনী অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি বাজাল, কিন্তু সেই ভাঙা থেকে কোনো সাপকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম না। তবে হ্যাঁ, বাপীর চোখে অশ্রু টলটল করছিল।

* * *

আমি মাকে বললাম, 'ওই দিকে মালীর ঘরে এক বেদেনী এসেছে।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বেদেনী ?'

'হ্যাঁ, সাপ-ধরা বেদেনী। বাপী ওকে সাপ ধরার জন্যে রেখেছে। প্রত্যেক সাপের জন্যে আট আনা করে পাবে।'

'কিন্তু তোর বাপী তো আমায় একবারও বলেনি !' তারপর তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা, চল, বেদেনীকে দেখিয়ে আন তো আমায়।'

আমি মাকে মালীর বাড়িতে নিয়ে গেলাম। মাটির বাড়ি। তাতে দুটি মাত্র ঘর। তার একটিতে বেদেনী মাথার চুল খুলে ভাঙা আয়নার সামনে বসে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। সামনে মাকে দেখেই তার হাত থেমে গেলো। ঘন নীল চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল হঠাৎ, যেন নদীর গভীর জলে কেউ পাথর ছুঁড়েছে। তারপর আস্তে আস্তে আবার চোখ নামিয়ে নিল সে।

মা তাকে এক নজর দেখে তক্ষুনি চলে এলেন সেখান থেকে। বাইরে মালী

তার অসুস্থ বৌয়ের পা টিপে দিচ্ছিল। তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'আরে, ও সাপ ধরবে কি, ও তো নিজেই নাগিনী!'

মা-র কণ্ঠস্বর দারুণ ক্ষুব্ধ। আমি বুঝতেই পারলাম না—মা তাকে নাগিনী বলছেন কেন! বেদেনী তো হুবহু মা-র মতোই একজন স্ত্রীলোক। সে নাগিনী হয় কি করে? আমার ধারণা, বড়রা মাঝে মাঝে দারুণ বোকার মতো কথা বলে। তাই আমি মাকে বললাম, 'অন্য মেয়েরা যেমন হয়, ও তো তেমনই একটা মেয়ে! তুমি ওকে নাগিনী বলছ কেন?'

মা জ্বলে উঠে বললেন, 'তুমি বুঝবে না ও সব। আর তোমায় কে বলেছে যে বড়দের কথার মধ্যে থাকতে? আমি তোমায় পঞ্চাশ বার বলেছি না যে বড়দের কথায় মধ্যে নাক গলাবে না! নইলে… !'

আমি চুপ করে গেলাম। ভয়ে পিছিয়ে গেলাম একটু। মা তৎক্ষণাৎ আমায় সঙ্গে নিয়ে বাংলোয় ফিরে এলেন। বলতে গেলে সারা রাস্তা ছুটিয়ে নিয়ে এলেন আমায়।

রাত্তিরবেলা। মা ভেবেছেন, আমি গাঢ় ঘুমে অচেতন। আসলে আমি তখনো জেগেই রয়েছি, চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি বিছানায়। সেই সময় মা বাপীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলেন।

'ওই মুখপুড়ি বেদেনীকে তুমি থাকতে বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সাপ মেরে ফেলার জন্যে।'

'তা ও কাজটা করার জন্যে কোনো বেদে পাওয়া যায়নি?'

'পাওয়া যায়নি বলেই তো ওকে রেখেছি।'

'আমি মানিনে ও কথা।'

'না মানতে চাও তো তুমি নিজে বেদে এনে দাও। আমি একে তাড়িয়ে দিয়ে তাকেই রাখব।'

'বেদে-বেদেনীর দরকারটাই বা কি? আমি তো আজ পর্যন্ত দেখিনি বাগানে কাউকে সাপে কেটেছে।'

'কাটেনি, কিন্তু কাটতে পারে তো?'

'এ সব তোমার বাজে তর্ক। সব বুঝি আমি। বেদেনীটা কাল যেন এখান থেকে চলে যায়।'

'যাবে না ও।'

'হ্যাঁ, যাবে।'

'না, যাবে না।'

'আমি ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়াব।' মা কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

বাপী হেসে বললেন, 'তুমি কি ক্ষেপেছ ? ক'দিনের ব্যাপার। বাগানের সাপগুলো ধরবে। তারপর নিজেই চলে যাবে। দিনভোর তোমার ছেলে বাগানে খেলে বেড়ায়। আমি যা করছি, সেটা ওর ভালোর জন্যেই করছি।'

কথাটা শুনেই হঠাৎ মা-র কান্না থেমে গেলো। যেন এতক্ষণে বাপীর কথা বিশ্বাস হলো তাঁর। বললেন, 'ঠিক বলছ তো ?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে তখনো কিছুটা সংশয়, কিছুটা বিশ্বাস।

বাপী মা-র চোখ মুছিয়ে দিলেন। আদর করে বললেন, 'পাগলী, এত বোকা হয়ো না। আমার ভালোবাসায় কি তোমার এখনো বিশ্বাস হয় না ?'

মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাশ ফিরে বাপীর বুকের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

কিন্তু সে দিনের সেই কথাবার্তার পরও তিনি বাপীর সঙ্গে আবার ঝগড়া শুরু করে দিলেন। একদিন সন্ধ্যা বী-র মাজারে বাপীকে বেদেনীর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেখেছিলেন তিনি। দেখেই তাঁর সারা গায়ে যেন আগুন জ্বলে গিয়েছিল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হয় আমি এখানে থাকব, না-হয় সেই নীল চোখওয়ালী নাগিনীটা থাকবে। কি চাও তুমি, বলো !'

বাপী বললেন, 'আস্তে কথা বলো, আস্তে কথা বলো। কাকার ঘুম ভেঙে যাবে। শুনে ফেলবে ও।'

'উঠুক না, উঠে শুনুক সব। শুধু আমার ছেলে কেন, সারা সংসারের লোক শুনুক। তোমার মতো এমন নির্লজ্জ পুরুষ সারা জগতে একটাও নেই। আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর এক দণ্ডও থাকব না। যদি কালকের মধ্যে ওই মোহিনী এখান থেকে বিদেয় না হয়, আমিই চলে যাব এখান থেকে।'

'এই তিন দিনে ও বাগানে গোটা কুড়ি সাপ ধরেছে, জানো !'

'কুড়িটেই ধরুক আর পঞ্চাশটাই ধরুক। আমি কালকেই ওর চুল ধরে ওই ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো ওকে।'

'তোমার মতো এমন সন্দেহ বাতিকের মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি। মিছিমিছি শুধু মানুষকে সন্দেহ করতে শুরু করো।'

'তা তুমি ওকে এখানে রেখে আমার সন্দেহটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ?'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আমারই হার হলো। আর হপ্তা খানেক পরেই আমি ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো। এই এক হপ্তায় ও যা পারে, বাগানের সাপ ধরে নিক। এর মধ্যে তুমি ওর সঙ্গে খামোখা ঝগড়া-ঝাঁটি করে মন খারাপ কোরো না। আমি যা করছি, তোমার ছেলের ভালোর জন্যেই করছি।'

'বেশ, তাহলে কেবল ওই এক হপ্তা ?'

'হ্যাঁ, কেবল এক হপ্তা।'

'তার বেশী এক দিনও নয় কিন্তু!'

'এক মুহূর্তও না।' বাপী মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন।

আমি একটা চোখ একটু ফাঁক করে ছিলাম, আবার তক্ষুনি বুঁজিয়ে ফেললাম। মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি এভাবে কথা বললে আমার মনে বিশ্বাস হয়।'

বাপী বেদেনীকে বলে দিলেন যে, সাত দিন পরে তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই ক'দিনের মধ্যে সে যতগুলো পারে, সাপ ধরে নিক। বেদেনী একবার তীক্ষ্ণ চোখে বাপীর দিকে তাকাল। কিন্তু বাপীর কথার উদ্দেশ্য তার বোধগম্য হলো না। সে চুপচাপ শঙ্কা বী-র টিলার দিকে চলে গেলো। সেখানে পা ফাঁক করে বসে জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে লাগল।

বাঁশির সুরে সেই মাধুর্য নেই, মাদকতা নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই—যেন শুধু প্রচণ্ড ক্রোধ ঝরে পড়ছে। আর সুরের মধ্যে এক অপরিচিত তরঙ্গ, যেন দংশন করে বিষ ঢেলে-দেওয়া নাগিনী ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে আরও বিষ প্রার্থনা করছে।

সপ্তম দিনে, যে দিন বেদেনীর চলে যাওয়ার কথা, সে দিন হঠাৎ মাকে সাপে কাটল। মা বাংলোর বাইরে পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবীলতায় জল দিচ্ছিলেন, এমন সময় কোত্থেকে একটা সাপ এসে পড়ল সেখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে মা-র গোড়ালির একটু ওপরে ছোবল মারল। মা চিৎকার করে পড়ে গেলেন।

বামুন ঠাকুর অমৃত সিং তাড়াতাড়ি ক্ষতর ওপরে দু' জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। একজন ছুটে গিয়ে বাপীকে ডেকে আনল। বাপী ক্ষতস্থান কেটে অনেকটা রক্ত বার করে দিলেন। তারপর সেখানে পারম্যাঙ্গানেট-অব্-পটাশ লাগালেন। তখন সাপের বিষের কোনো ইঞ্জেক্শন পাওয়া যেত না। বাপী এভাবেই সাপে কাটার চিকিৎসা করতেন। কখনো-সখনো দু' একটা রুগী বাঁচত, কিন্তু বেশীর ভাগই মারা যেত।

মা তখনো সম্বিৎশূন্য। নীল হয়ে আসছে তাঁর শরীর। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। আমি তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদছিলাম।

হঠাৎ বাপী উঠে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে সোজা মালীর ঘরে গেলেন। বেদেনী তখন নিজের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা করে ফেলেছে। কামিজ দুটো কেচে পরিষ্কার করে নিয়েছে, নদীর নরম বালি দিয়ে ঘষে ঘষে তার রুপোর গয়নাগুলো ঝকঝকে করে তুলেছে, আখরোটের ছাল দিয়ে নিজের ঠোঁট রাঙিয়েছে। চুলে একটা বড় গোলাপ ফুল গুঁজেছে। বাপী যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বাপী বললেন, 'রাজু, চলো।'

বেদেনী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'ও মায়া যাচ্ছে। ওকে বাঁচাও রাহু।'

'ও সব রাহু-মাহু ছাড়ো।'

'ওকে বাঁচাও। আমার ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না।'

'আমার কাছে কোনো ওষুধ নেই। আমি শুধু সাপ ধরি, সাপের বিষ নামাতে পারিনে।'

'তোমার কাছে সাপের বিষের ভালো ওষুধ আছে —আমি জানি।'

'হাঁ, ছিল। হারিয়ে ফেলেছি সেটা।' বেদেনী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল। তার কণ্ঠস্বরে ভীষণ কঠোরতা ও বিরক্তি।

বাপী তাকে দু'হাত বাড়িয়ে ধরলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'না বলো না রাহু। ওকে বাঁচাও। যেমন করে হোক, তুমি ওকে বাঁচাও। ও মরে গেলে আমি আর বাঁচব না।'

বেদেনী চোখ তুলে বাপীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি ওর জন্যে কাঁদছ! আর আমার জন্যে এক ফোঁটা জলও নেই তোমার চোখে।'

বেদেনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে নিজের ঝাঁপি দুটো তুলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই হোক।'

বাপীর সঙ্গে সঙ্গে সে মা-র বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। মা-র পায়ের ক্ষত-স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষে চুষে অনেক রক্ত টেনে বার করে দিলো। তারপর সে তার থলে হাতড়ে একটা কালো রঙের কৌটো বার করল। কৌটো খুলে তা থেকে সবুজ রঙের মলম নিয়ে লাগিয়ে দিলো ক্ষতস্থানে। পরে সে দৌড়তে দৌড়তে বাগানে গেলো এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড় বড় দীঘল পাতার একটা গাছ তুলে আনল। সেটা থলে ছেঁচে রস বার করে সেই রস মা-র মুখে দিতে শুরু করল। কয়েক ফোঁটা পেটে যেতেই মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠা বন্ধ হলো। এখন ধীরে ধীরে মা-র শরীরের নীলচে ভাবটা কেটে যাচ্ছে। মা আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালেন। বেদেনী সরে গেলো সেখান থেকে। বাপী এগিয়ে এসে আদর করে মা-র মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন মনে হচ্ছে?'

মা দুর্বল গলায় বললেন, 'ভালো মনে হচ্ছে। কাকা কোথায়?'

আমি কাঁদতে কাঁদতে মা-র গলা জড়িয়ে ধরলাম।

একটু পরেই আমি, মা ও বাপী তিন জনেই খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ বাপীর যেন কি মনে পড়ল। বললেন, 'জানকী, কে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, জানো?'

মা মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি কিছুই জানেন না।

বাপী ভিড়ের দিকে চেয়ে বেদেনীকে ডাকলেন, 'রাহু, এ দিকে এস।'

কিন্তু কোথায় যায়! বেরেনী আগেই সেখান থেকে চলে গেছে।

বেরেনী আর কখনও আমাদের এলাকায় ফিরে আসেনি। তবে হ্যাঁ, শীতকালে রাত্তিরবেলা যখন চারদিক বরফে ঢেকে যেত, তখন নদীর ওপার থেকে মৃদু তরঙ্গায়িত বাঁশির সুরলহরী ভেসে আসত। সেই সুর কানে এলেই বাপী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন, অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারি শুরু করতেন। আর দূরে নদীর জলের ওপর দিয়ে সেই সুরলহরী হাওয়ার সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে ভেসে আসত, যেন কোনো তুষারাবৃত প্রান্তরে একটি শিশু হারিয়ে গেছে, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সে তার পথের কথা জিজ্ঞেস করছে…

নয়

দারোগা নিয়াজ আহম্মদ বাপীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিও বাপীর মতোই সুপুরুষ। বাপী দেখতে শুনতে খুব ভালো। লম্বায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। শ্যাম বর্ণ ও গৌর বর্ণের মাঝামাঝি রঙ। প্রত্যেকের সঙ্গে খুব নরম গলায় মিষ্টি সুরে কথা বলেন, আর তাঁর কথা যে শোনে, সে-ই মুগ্ধ হয়।

কিন্তু দারোগা নিয়াজ আহম্মদ আরও একটু বেশী। ছবিতে মানুষ যেমন সুন্দর হয়, তেমনি সুন্দর তিনি। সাড়ে ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, সরু কোমর, চওড়া বুক। দাঁতগুলো যেমন সাদা, তেমনি ছোট ছোট। পাকানো গোঁফ। চওড়া কপালে একটা পুরনো কাটা দাগ। সেটা তাঁর সাদা কপালে একটি স্থায়ী কুঞ্চন রেখার মতো দেখায়। সে জন্যে যখন তিনি মৃদু মৃদু হাসেন, তখনো মনে হয়, তিনি কোনো ব্যাপারে চিন্তামগ্ন হয়ে হাসছেন। তাঁর এই ভাবভঙ্গিটা মেয়েদের খুব পছন্দ।

দারোগা নিয়াজ আহম্মদ প্রায়ই বাইরে থাকেন। যখন ফেরেন, তখন রোজ সন্ধ্যেয় বাপীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন বাপীর বাংলোয় ফিরতে বেশ রাত্তির হয়। হাসপাতালের স্পেশাল ওয়ার্ডে তাঁদের আড্ডা জমে। স্পেশাল ওয়ার্ড সাধারণত খালি পড়েই থাকে। আর খালি না থাকলে খালি করিয়ে নেন। কারণ বাড়িতে মা-র আধিপত্য। মদ ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ রয়েছে। আর বাপীর ও দুটোতেই মাঝে মাঝে দারুণ শখ হয়। দারোগা নিয়াজ আহম্মদ বাইরে থেকে ফিরে এলে তাঁদের দু' জনের শখ মেটে তখন। দুই দোস্ত স্পেশাল ওয়ার্ডে বসে বসে নিজেরাই মুরগী রান্না করেন, নানা রকমের মশলা প্রয়োগ করে মাংসকে সুস্বাদু করে তোলেন। গালগল্প চলে, গান চলে। গভীর রাত্রিতেও বাগান থেকে তাঁদের অট্টহাসি শোনা যায়। ঐ সময় মা-র চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, উসকো-খুসকো দেখায় তাঁকে। মাধবীলতার কাছে বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি বাপীর প্রতীক্ষা করেন। রাত্রি এগারোটা বারোটা, কখনো কখনো রাত্রি একটার সময় বাগানের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাপীকে টলতে টলতে আসতে দেখা যায়। দরাজ গলায় গাইতে থাকেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে··· ।' ওই গানটা শুনলে মা ভীষণ রেগে যান। গান কোথায়, একটাই কলি। মদ খেয়ে নেশা হলে কিংবা অন্য সময় কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকলে তিনি গাইতে থাকেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে··· ।'

মা ঝাঁজাল গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা তোমার এই গানের কোনো মাথামুণ্ডু আছে? যখনই দেখো গাইছে তো গাইছেই···'

বাপী বলেন, 'আছে গো আছে। মানে না থাকলে কি আর শুধুই গাই! বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে —বাঁশি যখন বেজে ওঠে, সে বাঁশির ডাক —সমস্ত সংস্কার, সমস্ত গতানুগতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ডাক, দুঃসাহসে ভর করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান। যাদের কান আছে, তারা ঠিকই সে ডাকের অর্থ বোঝে। কান মানে তোমার এই সোনার রিং-ঝোলানো কান নয়। ভগবানের দিব্যি করে বলছি জানকী, আজ তোমায় ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। এই রঙ এই রূপ তুমি কোথায় পেলে বলো তো? তোমার মা তো দেখতে একেবারে কুচ্ছিৎ ছিল!'

মা রাগে জলে উঠে বললেন, 'আমার মা কোথায় কুচ্ছিৎ ছিল —খুব সুন্দরী ছিল দেখতে, তোমার মা-র চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল। ...এই কাকা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছ! তোমায় আমি পঞ্চাশ বার বলেছি না —যাও, চলে যাও এখান থেকে —শুয়ে পড়ো বলছি...'

'আরে, ও এখনো জেগে আছে?' বাপী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, আমার মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া করে দিতে লাগলেন।

'বাপ বারোটা পর্যন্ত মদ খেয়ে বেড়াবে তো ছেলে কি শুয়ে শুয়ে ঘুমোবে?'

মা রাগে তিড়বিড় করে উঠে আবার আসল কথায় ফিরে এলেন। তিনি এখন ঝগড়া করতে চান। নিয়াজ আহম্মদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাপী ফিরলে প্রায়ই এ রকম হয়। কিন্তু সেই ঝগড়ার আগেই শুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমায়। তারপর বারান্দার চেয়ারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বসে বসে ঝগড়া করেন। ঝগড়াটা ভারি চমৎকার। কারণ বাপী তো মদ খেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে থাকেন। খুব মেজাজের সঙ্গে মা-র কথার জবাব দিয়ে যান। মৃদু মৃদু হাওয়া বইতে থাকে। দূর উপত্যকা ছাড়িয়ে নদীর জল রূপোর পাতের মতো ঝক্‌ঝক করে। বাগানের ফুলের গন্ধে বারান্দাটা ম-ম করে। তাই এমন এক শুচি-স্নিগ্ধ পরিবেশে খুব পরিচ্ছন্ন কেতাদুরস্ত ঝগড়া হয়। দাবা খেলার মতো ঝগড়ার নিয়ম-কানুনও রয়েছে। প্রথমে মা বেশ চড়া গলায় কথা বলেন, বাপীর গলার স্বর তখন খাদে। তারপর মাঝখানে বাপীর গলা চড়তে থাকে। শেষে মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে যান এবং আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। ওটা এক বিশেষ লক্ষণ। তার মানে এ বার মিটমাট হবে। এর পর বাপী চেয়ার থেকে ওঠেন, আদর করে মা-র হাত ধরে খুব নরম গলায় এবং ভীষণ ভদ্রভাবে ক্ষমা চাইতে থাকেন। তারপর আমি আর কিছু জানতে পারি না। আনন্দে লেপের তলায় ঘাপটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ি। যতদিন নিয়াজ আহম্মদের সঙ্গে বাপীর আড্ডা হয়, ততদিন এ সব চলতেই থাকে।

নিয়াজ আহম্মদের স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু তিনি আর বিয়ে করেননি। প্রথম স্ত্রীর এক ছেলে রয়েছে, শহরে পড়াশোনা করে। নিয়াজ আহম্মদের বয়েস

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী হবে না, কিন্তু দেখায় পঁচিশ বছরের যুবক। বলিষ্ঠ গড়ন। ভোরবেলা কেল্লার পুলিশ ফাঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীর ধারে আসেন, তারপর জাঙিয়া পরে ব্যায়াম শুরু করেন। সকালের সোনালী রোদ্দুরে যখন তাঁর ধবধবে ফরসা চেহারা কাঁচা সোনার মতো দেখায়, তখন কলসি মাথায় নিয়ে মেয়েরা পথ চলতে চলতে আড়চোখে চেয়ে দেখে, নিতান্ত অভিভূত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়, কিন্তু আবার চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হয়, আবার অভিভূত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথ পাড়ি দেয় তারা। নিয়াজ আহম্মদ জানেন, এক হাজার একটি মেয়ে, বিবাহিতা অবিবাহিতা উভয়ই, তাঁর জন্যে মাথা কুটছে।

ভালো ভালো অভিজাত বাড়ি থেকেও তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু তবু তিনি বিয়ে করেননি। কেন বিয়ে করেননি, সেটা এক রহস্য এবং সে রহস্য একমাত্র বাপীই জানেন।

কিছুদিন থেকে নিয়াজ আহম্মদের চাল-চলনে পরিবর্তন এসেছে। আগে তো তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্যে দূরে পাড়ি জমাতেন। মাসে বড় জোর পাঁচ ছ'দিন সদরে কাটাতেন। আর সেই পাঁচ ছ'দিন মা বাপীর সঙ্গে ঝগড়া করে, কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিতেন কোনো রকমে।

কিন্তু বছর খানেক থেকে নিয়াজ আহম্মদ বাইরে কম সময় কাটান। আগে তো মাসে পাঁচ ছ'দিনের জন্যে আসতেন। তারপর আট-দশ দিনের জন্যে, ক্রমে বারো দিন, বিশ দিন করতে করতে মাস চারেক হলো এখানেই রয়েছেন। গত চার মাসে তিনি একবারও বাইরে যাননি। এখন মা-র বড় দুর্দিন চলছে।

তারপর সে দিন রাত্রিবেলা ভীষণ গণ্ডগোল। পুলিশ এসে আমাদের বাংলো ঘিরে ফেলল। শুধু আমাদের বাংলো নয়, সব অফিসারের বাংলোই ঘিরে ফেলল তারা। প্রত্যেকের বাড়িতে খানাতল্লাশী চলল। মনে হচ্ছে, যেন সারা শহরে এখানে-ওখানে আগুন লেগেছে। ভয় পেয়ে লোক পালিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। রাস্তায় পুলিশ টহল দিচ্ছে। সন্দেহ হলেই যে কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ছে, তল্লাশী চালাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, রাজাসাহেব দারোগা নিয়াজ আহম্মদকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা জারি করেছেন। পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। যে কেউ নিয়াজ আহম্মদকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় রাজাসাহেবের সামনে হাজির করতে পারবে, তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বড় বড় অফিসারদের বাড়ি পর্যন্তও তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। কারণ নিয়াজ আহম্মদ অফিসারদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। পুলিশ সারা রাত ধরে সমস্ত বাংলো পাতিপাতি করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও নিয়াজ আহম্মদের সন্ধান পাওয়া গেলো না।

পুলিশ চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধরে মা ও বাপী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিস্‌ফিস করে কথা বলছেন—ওঁদের ধারণা, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাছাড়া ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে, তাঁরা খুব নীচু স্বরে কথা বলছিলেন। ব্যাপারটা হলো, নিয়াজ আহম্মদ আমাদের বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছেন, মা তাঁকে নিজের খাস কামরা অর্থাৎ ঠাকুর ঘরে রাম-সীতার বিগ্রহের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। পুলিশ ঠাকুর ঘরখানাও খুলে দেখেছিল, কিন্তু ভেতরে ঢোকেনি। দরজা থেকে ভেতরে উঁকি মেরে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কারণ সেটা পূজার ঘর, আর মা-র কড়া মেজাজের কথা সবাই জানে। তারা এটাও জানে যে, ধর্মের ব্যাপারে মা কি রকম শুচিবায়ুগ্রস্ত। সুতরাং তাদের কি করে সন্দেহ হবে যে, মা একজন মুসলমানকে তাঁর ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দিয়েছেন এবং নিজের ইষ্টদেবতার পবিত্র বিগ্রহের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন তাকে!

আর সত্যিই, মা কিছুতেই সে কাজ করতেন না, যদি বাপী মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে বাধ্য না করাতেন। মা যখন কোনো মতেই রাজি হচ্ছিলেন না, তখন বাপী রেগে গিয়ে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করার হুমকি দিলেন। তাতে ফল হলো, মা রাজি হলেন। কিন্তু পুলিশ চলে যেতেই তিনি আবার চাপা গলায় বাপীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছেন।

'এর ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। নিজের চাকরির ব্যাপারে হাত ধুতে হবে তোমায়।'

'আর ওই যে বেচারা, যাকে নিজের প্রাণের ব্যাপারেই হাত ধুতে হচ্ছে, তার কথা কিছুই ভাবছ না?'

'যেমন তার কীর্তি, তেমনি ফল পাবে। কেন সে অমন করতে গেলো?'

'ও আবার কি করল? রাজাসাহেবের বোন নিজেই তো ওকে ভালোবেসে ফেলেছে, তাতে ও কি করবে?'

মা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কি করবে? তাকে নিষেধ করে দিত। রাজা রাজাই। কর্মচারী কর্মচারীই। তাছাড়া সে হিন্দু ও মুসলমান। এর পরিণাম কখনও ভালো হতে পারে না। তাতে দু'জনকেই ধর্মভ্রষ্ট হতে হয়।'

'ভালোবাসা কখনও ধর্মের বিচার করে না।'

'তুমি তো নাস্তিক। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর্যসমাজী, অন্তত একজন মুসলমানকে নিজের ঘরে ঠাঁই দেবে না। কিন্তু তুমি তো আর্যসমাজ থেকেও দূরে সরে গেছ একেবারে। কঠিন নাস্তিক তুমি।'

'কিন্তু বন্ধুত্ব বলেও তো একটা জিনিস আছে!'

'আর ধর্মটা বুঝি কিছু নয়? তোমায় তো নিজের ধর্মের দিকে লক্ষ্য নেই! ওর এত সাহস যে রাজাসাহেবের বোনের সঙ্গে পিরিত জমাতে গেছে! আর তোমারও বলিহারি, তুমি তাকে এনে ঘরে তুললে?'

'জানকী !' বলেই বাপী বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। জোরে মা-র হাত দুটো ধরে বললেন, 'বন্ধুত্বও যে একটা ধর্ম, সেটা তোমার জানা নেই। সে নিজেই একটা সমাজ। তোমার ধর্মের যেমন ক্রিয়াকলাপ আছে, তেমনি বন্ধুত্বেরও নিজের ক্রিয়াকলাপ আছে।'

মা নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার নিজের ধর্মের ক্রিয়াকলাপ আমার ধর্মের আচরণের ওপর চাপিয়ে দেবে। স্নান না করলে, যে মন্দিরে আমি তোমাকেও ঢুকতে দিইনে, সেই মন্দিরে আজ তোমার মুসলমান দোস্তকে ঢুকতে দিতে হলো আমায়। জানিনে ভগবান এ জন্যে কি শাস্তি দেবেন! জীবনে আমি যা কখনও করিনি, তাই আজ আমাকে করতে হলো। ভগবানের মন্দির অশুচি করলাম। তুমি সেটাও আজ আমাকে দিয়ে করালে।'

মা কাঁদতে শুরু করলেন।

বাপী মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ক'দিনের তো ব্যাপার! গোলমালটা একটু থিতিয়ে গেলে, পুলিশ-মিলিটারির দৌড়-ঝাঁপ কমলে, ও তো নিজেই এখান থেকে চলে যাবে। এই এলাকা ছেড়েই পালিয়ে যাবে ও। এখানে থাকতে গেলে তো ওর নিজেরও প্রাণের ভয় আছে।'

'শুধু ওর প্রাণের ভয় নয়, তোমার প্রাণের ভয়ও আছে। ভুলে যেও না, তুমিও রাজাসাহেবের একজন কর্মচারী। আর কর্মচারী হয়ে বেপরোয়াভাবে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ। আমি তোমায় আর বেশী কিছু বলতে চাইনে, শুধু বলছি, তোমার দোস্তকে বলে দাও, সংক্রান্তির আগে যেন সে এখান থেকে মুখ কালো করে বেরিয়ে যায়—সংক্রান্তির দিন আমি নিজের হাতে গঙ্গাজল দিয়ে মন্দির ধোব। মুণিরজীকে ডাকিয়ে একুশ দিন কথা পাঠ করাব, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাব। প্রায়শ্চিত্ত করে তার প্রসাদ একুশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাব। তবেই আমার মনে সোয়াস্তি আসবে।'

পাশের ঘরে কিসের যেন আওয়াজ হলো। ভয় পেয়ে বাপী বললেন, 'আস্তে বলো, আস্তে বলো। ও হয়তো শুনে ফেলবে সব!'

মা রুক্ষ মেজাজে গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনলে শুনুক না!'

'চুপ' বলেই বাপী মা-র মুখে হাত চাপা দিলেন। তারপর ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলেন তিনি।

পাশের ঘরখানাই ঠাকুর ঘর। সেখানেই নিয়াজ আহম্মদকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সে ঘরে আবার একটা শব্দ হলো। তারপর চারদিক স্তব্ধ। দুটি ঘরের মাঝখানের দরজা দু' দিক দিয়েই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। শুধু ঘুলঘুলিটা সামান্য খোলা। বাপী বললেন, 'কাল সকালে ঘুলঘুলির কাঁচটাতে কালো কাগজ সেঁটে দেবো।'

'ঠিক আছে।' মা ফিস্‌ফিস্ করে বললেন। তারপর তিনি ঘুমোবার আগে কি যেন জপ করতে শুরু করলেন। এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস।

পরদিন সকালবেলা মা সকলের আগেই উঠে পড়লেন। চাকর-বাকরেরা তখনো ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি নিজের হাতেই চা ও জলখাবার তৈরি করলেন। তারপর একটা ট্রেতে সাজিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন। কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এলেন তিনি। দ্রুত শোবার ঘরে এসে বাপীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে কি যেন বললেন। দু' জনের মুখ চোখের চেহারাই ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বাপী তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পাজামার দড়িতে গিঁট দিতে দিতে বললেন, 'কোন দিকে? কোথায়? কি করে?'

বাপী ছুটতে ছুটতে ঠাকুর ঘরে গেলেন; কিন্তু সেখানে কেউ নেই। নিয়াজ আহম্মদকে ঠাকুর ঘরের কোথাও দেখা গেলো না। ঘরের পেছন দিকে একটা জানলা রয়েছে। রাতের অন্ধকারে সেই জানলা খুলে কোথায় চলে গেছে সে।

সেই দিনই সকাল আটটার কাছাকাছি কেল্লার পুলিশ ফাঁড়ির সিঁড়ির নীচে কাঁচা রাস্তার ওপর তার লাশ পাওয়া গেলো। কে তাকে মেরে তার লাশটাকে চার টুকরো করে রেখেছে। অথচ তাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই পুরস্কার নিতে এল না কেউ।

বাপী তখন চান-টান সেরে কাপড় পরে জলখাবার খেতে বসেছেন। এমন সময় হাসপাতালের আর্দালি এসে জানিয়ে গেলো যে লাশঘরে দারোগা নিয়াজ আহম্মদের লাশ আনা হয়েছে পোস্ট মর্টেমের জন্য। কথাটা শুনেই বাপী ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে মা-র দিকে তাকালেন। মা সন্ত্রস্ত ও অনুতপ্ত হয়ে নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন। বাপী জলখাবার না খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, অমনি মা-র হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেলো মেঝেয়। চেয়ারের ওপর ভর দিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

বাপী দু' দিন কিছু খেলেন না। ক'দিন ধরে মা-র সঙ্গে কথাও বললেন না। এ দিকে সংক্রান্তি এসে গেলো। নিয়মমাফিক সপ্ত শস্য দিয়ে ওজন করা হলো আমায়। আমার কোরা ধুতি মুন্সিরজীকে দিয়ে দেওয়া হলো। মা আমায় গুরুদ্বারে নিয়ে গেলেন। গুরুদ্বারের বাইরে মন্দিরের ঘন্টা বাজালাম আমরা। তারপর সেখান থেকে শাহ্ মুরাদের মাজারের দিকে রওনা হলাম। কিন্তু আজ মাকে বড় উন্মনা দেখাচ্ছে। কি যেন ভাবছেন তিনি, আর মাঝে-মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

আমরা শাহ্ মুরাদের মাজারে পৌঁছেই দেখলাম, মাজারের কাছে নির্জন পথের ওপর রাজবাড়ির একখানা পাল্‌কি। পাল্‌কির কাছে চার জন কাহার দাঁড়িয়ে।

মা রাজবাড়ির পাল্‌কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন সেখানেই। আমাকে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে সরে গেলেন তিনি। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে মা আমায় চুপিচুপি বললেন, 'তুই তো ছেলেমানুষ। রাজবাড়ির কাহারেরা তোকে যেতে দেবে। গিয়ে দেখে আয় তো মাজারে কি হচ্ছে।'

মা সেখানে সেই গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁর অনুমতি পেয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লাম। রাস্তার ধুলোবালি উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে যে দিকটায় ফুল গাছ রয়েছে, সে দিকটায় গেলাম। কাহারেরা তো কিছু বলল না, কিন্তু জবুরা দেখে ফেলল আমায়। সে আমায় দেখতে পেয়েই ইশারা করে ওখানেই দাঁড়াতে বলল। আমি একটা গাছের কাছে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম, এটাও হয়তো জবুরার কোনো খেলা। জবুরা চুপিচুপি আমার কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মাজারে এখন কেউ যেতে পারবে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

জবুরা সে কথার জবাব দিলো না। শুধু বলল, 'কিন্তু আমি তোমায় নিয়ে যাব।'

'কি করে?' আবার প্রশ্ন করলাম আমি।

কিন্তু জবুরা আমার সে প্রশ্নেরও জবাব দিলো না। সে আমায় হাত ধরে এগিয়ে চলল। ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে, কখনো ছুটতে ছুটতে, কখনো-বা পা টিপেটিপে সে আমায় নিয়ে গেলো ফুল গাছের ঝোপের মধ্যে। সেখানে আমরা দু'জনেই ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম। ফুল গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা।

চাচা রমজানি মাজারের কাছে বসে আছেন। তাঁর সামনে সাদা বোরকা-পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মুখের সামনে বোরকার পর্দাটা সরিয়ে দেয়নি, সর্বাঙ্গ বোরকায় ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'রাজবাড়ির রাণী হবে হয়তো!' আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়েই রইলাম। কারণ আমাদের এখানে শুধু মুসলমান মেয়েরাই বোরকা পরে, আর সে বোরকাও সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে। শাহী খানদানী মেয়েরাই শুধু সাদা বোরকা পরে।

চাচা রমজানি রুদ্ধশ্বাসে চোখ বড় বড় করে সাদা বোরকা-পরা মেয়েটির দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর তসবি-ধরা (জপমালা) হাতখানা থরথর করে কাঁপছে।

বোরকা-পরা মেয়েটি প্রায় হুকুমের সুরে বলল, 'আর তুমি আমার এখানে আসা নিয়ে কারও কাছে গল্প করবে না।'

রমজানি মাথা নেড়ে 'না' জানালেন।

'আর তুমি সব নজর-নিয়াজ দেবে তো?'

চাচা রমজানি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালেন।

'তুমি কবরে রোজ বাতি জ্বালাবে, ফুল ছড়াবে। এ ব্যাপারে আর যা যা করতে হয়, সব করবে।'

রমজানি আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মেয়েটি বোরকার ভেতর থেকেই অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রমজানির দিকে। তারপর বোরকার একপ্রান্ত থেকে মুহূর্তের জন্যে তার দু'তিনটি সরু সরু কোমল আঙুল বেরিয়ে এল, একশো টাকার কয়েকখানি নোট পড়ল রমজানির থলেতে, তারপর আঙুলগুলো আবার বোরকার মধ্যে ঢুকে গেলো।

রমজানি দ্রুত তসবি গুনতে শুরু করলেন।

'কবরটা কোথায়?' মেয়েটি তেমনি হুকুমের গলায় জিজ্ঞেস করল।

চাচা রমজানি চোখ তুলে সামান্য ইঙ্গিত করতেই মেয়েটি বুঝে নিল সঙ্গে সঙ্গে। সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে মাজারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোরস্তানের দিকে চলে গেলো। সেখানে একটি কাঁচা কবর, সেই কবরটির দিকেই চোখের ইঙ্গিত করেছিলেন চাচা রমজানি। মেয়েটি গোরস্তানের দিকে গেলে আমি আর জবুরা চোখ ফিরিয়ে সে দিকে তাকালাম।

মেয়েটি কাঁচা কবরের কাছে গিয়ে থামল। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর হঠাৎ সে দু' হাত প্রসারিত করে কবরের ওপর লুটিয়ে পড়ল। অল্প জলে মাছ যেমন ছটফট করে, তেমনি তার হাতের আঙুলগুলো কবরের ওপর অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল।

একটু পরে আঙুলগুলো এক সময় শান্ত হয়ে এল। হঠাৎ যেন কুল গাছের ঝোপে স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। মাজার অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো। চাচা রমজানির তসবির দানাগুলো কাঁপতে লাগল। আমি আর জবুরা ভয়ে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

একটি দীর্ঘ নীরবতার পর মেয়েটি সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এখন তার পা টলছে। সাদা বোরকা ধূসর মাটিতে একাকার হয়ে গেছে। কবরের জায়গা থেকে দ্রুত পায়ে ফিরে আসছে সে। দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে ঝোপঝাড় আর পাথরগুলো অতিক্রম করে মাজারের বাইরে রাস্তায় এসে পৌঁছালো। কাউকে কিছু না বলেই পাল্কিতে উঠে বসল সে।

কাহারেরা পাল্কির পর্দা ফেলে দিলো। তারপর কাঁধে পাল্কি তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

জুনিয়র অফিসার মহলেও বাহাদুরকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না। সরকারী কর্মচারীদের তালিকায় তার নাম বাহাদুর আলি খাঁ। কিন্তু লোকে তাকে বাহাদুর বলেই ডাকে। কারণ সে এই সে দিনও বুড়োদের কলকের আগুন তুলে বেড়াত। প্রায় খালি গায়ে ঘুরত ফিরত। কখনো এখানে নিজের খাবার জুটিয়ে নেয় তো কখনো ওখানে। আজ এখানে পড়ে ঘুমোয় তো কাল সেখানে। কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ চৌকস ছিল সে। তাই দেখে বাপী রাজাসাহেবকে বলে-কয়ে তার জলপানির ব্যবস্থা করে দেন। সেই জলপানির জোরেই বাহাদুর লাহোর থেকে এনট্রান্স পাশ করে ফিরে আসে।

তারপর রাজাসাহেব খানিকটা খেয়াল বশত এবং সম্ভবত খানিকটা নিজের হিন্দু কর্মচারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করার জন্যে বাহাদুরকে প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার করে দেন। ফলে কালকের সেই বাহাদুর আজ বাহাদুর আলি খাঁ। এখন সে জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে টক্কর দিতে সব সময়েই প্রস্তুত। কারণ সে লাহোর থেকে শুধু জে. এ. বি. ডিগ্রি নিয়েই আসেনি, সেই সঙ্গে মুসলিম লীগের মতবাদে দীক্ষা নিয়েও এসেছে। সে সময় মুসলিম লীগ কথাটায় অনেকেরই ভীষণ আপত্তি ছিল। কিন্তু বাহাদুরকে তার জন্যে শুধু ঠাট্টা-তামাশাই করা হতো। বাপীও তার কথাবার্তা মোটেই পছন্দ করেন না। মনে মনে অনুতাপ করেন, কেন যে তিনি তার জলপানির জন্যে রাজাসাহেবের কাছে সুপারিশ করেছিলেন!

কিন্তু এখন আর কি করার আছে! বাহাদুর এখন প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাস্টার। এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে সে-ই প্রথম, যে এনট্রান্স আর জে. এ. বি. পাশ করে এসেছে। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে গেলো স্বর্গীয় চৌধুরী দীনমহম্মদের মেয়ে গুলনারের সঙ্গে। বিধবা মেয়ে। রূপ-গুণের খ্যাতি চার দিকে। তাছাড়া ধনী হিসেবেও বেশ নাম-ডাক। কারণ চৌধুরী দীনমহম্মদের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর সমস্ত জমি-জায়গা-বাগান, দুটি আটা-চাকি এবং একখানি বাড়ি দুই মেয়ের নামেই লিখে দিয়ে গেছেন। গুলনারের ছোট বোন লায়লার বয়সও তখন বছর ষোলো। তারও রূপের খ্যাতি চার দিকে। গুলনারকে বিয়ে করতে অনেকেই ইচ্ছুক ছিল। গুলনার কিন্তু মালা দিলো বাইশ বছরের যুবক বাহাদুরের গলায়। আর বছর দুয়েক পরে গুলনারের উদ্যোগেই বাহাদুরই তার ছোট বোন লায়লাকেও দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করল।

সে দিনের অনাথ বাহাদুর এখন বাহাদুর আলি খাঁ। প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার। সুন্দরী স্ত্রীর ধন-ঐশ্বর্যে সৌভাগ্যবান। এখন সে ভূস্বামী, আটাকলের মালিক, অঞ্চলের মধ্যে ধনশালী ও সম্মানিত অভিজাত ব্যক্তি। এ সব কি অন্যান্য জুনিয়র অফিসারদের ক্ষেপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?

ব্যাপারটা যদি জুনিয়র অফিসার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে এমন কিছু আশঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে বাহাদুরের সাহস এত বেড়ে গেলো যে, সে বাপীর সঙ্গেই মুখোমুখি ঝগড়া করে বসল —এমন কি মারামারি করতেও চেয়েছিল।

ঘটনাটি এই রকম। মা কিছু দিন থেকেই বলে আসছিলেন, 'ছেলে বড় হলো, ওকে স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো ···ইত্যাদি। বাপী একদিন বাহাদুরকে ডেকে পাঠালেন, স্কুলের ছুটির পর সে যেন বাংলোয় এসে দেখা করে। আমি তো সারাদিন ধরে কাঁদছি। কারণ, স্কুল যাওয়াটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। বাগানে খেলাধুলো করা, গাছে চড়া, নদীতে সাঁতার কাটা, জংলী পাখিদের বাসা হাতড়ে বেড়ানো, এ সবই পছন্দ। স্কুলটাকে কয়েদখানা বলে আমার মনে হয়। আর কয়েদখানা কে-ই বা পছন্দ করে ? কিন্তু মা-র পীড়াপীড়িতে বাপী যখন শেষ পর্যন্ত বাহাদুরকে ডেকে পাঠালেন, তখন তাকে দেখার জন্যে আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এর আগে আমি তাকে দূর থেকেই দেখেছি, দেখে আমার একটুও ভালো লাগেনি। তার চোয়াল দুটো ভেতরে বসে গিয়ে মুখখানা যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চিবুকটা লোহার তৈরি একটা কলের মতো হাওয়ায় নড়ছে যেন। গায়ের রঙটাও লোহার মতো। কালো লোমে ভর্তি বড় বড় হাত পা, হাত-পায়ের মজবুত হাড় চোখে পড়ে। সব সময়েই যেন সন্দেহের চোখে লোকের দিকে তাকায়, আর কাঁধে একটা অদ্ভুত ধরনের ঝাঁকানি দিতে দিতে পথ হাঁটে।

এখানেও সে সেইভাবেই হেঁটে এল। বাপী তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কাছে আসতেই বাপী এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বসার জন্যে আরাম কেদারা এগিয়ে দিলেন, আর অমনি সে ধপ করে বসে পড়ল। আমি বাপীর আরাম কেদারার হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমায় বললেন, 'কাকা ইনি তোমার হেডমাস্টার। সালাম করো।' আমি তো সালাম করার বদলে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছি, এ দিকে আমার গায়ে ঘাম ছুটছে। বাপীর চেয়ারের আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাতলটা জোরে চেপে ধরলাম। ওটাই যেন আমার শেষ আশ্রয়। তারপর বাপী যখন বেশ কড়া গলায় আবার বললেন, 'খোকা, ওঁকে সালাম করো।' তখন আমি তাড়াতাড়ি কপালে হাতটা ছুঁইয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির ভেতরে দৌড় দিলাম। মা-র কাছে গিয়েই কাঁদতে শুরু করে দিলাম, 'না না, আমি স্কুলে যাব না। আমি কিছুতেই ওই কালো মাস্টারের কাছে পড়ব না।'

মা আমায় নানা রকম সান্ত্বনা দিলেন, আদর-সোহাগ করতে লাগলেন। কিন্তু আমি আমার ময়লা হাতে শুধু চোখের জল মুছে যাচ্ছি, আর চাপা গলায় কাঁদছি। মা চা তৈরি করে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। এমন সময় বারান্দা থেকে বেশ চড়া গলার কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেলো। মা সব কাজ ফেলে রেখে তক্ষুনি ছুটলেন। বারান্দার দিকের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। আমিও গিয়ে মা-র পিছনে দাঁড়ালাম।

বাপী বলছিলেন, 'আমি জানি, তুমি মুসলমান ছেলেদের বেশী বেশী করে নম্বর দাও। ক্লাসের মধ্যে তাদের ফার্স্ট-সেকেণ্ড করে দাও, যাতে তারা সরকারী জলপানি পায়। হিন্দু ছেলেদের তুমি সমান চোখে দেখো না।'

বাহাদুর বলল, 'মিথ্যে কথা। মুসলমান ছেলেরা বেশী খাটে, তাই তারা ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে।'

বাপী জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে পেত না কেন?'

'আগে ওরা পড়াশুনা করত কোথায়! সারা স্কুলটা তো হিন্দু ছেলেতেই ভর্তি ছিল! আগের হেডমাস্টারও ছিল কট্টর হিন্দু। ইচ্ছে করেই মুসলমান ছেলেদের ফেল করিয়ে দিত।'

'বাজে কথা। এটা তোমার আবিষ্কার। ...লাহোর থেকে তুমি যে মুসলিম লীগের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এসেছ, সেই সবই তোমার মাথাটাকে খারাপ করে দিয়েছে।'

বাহাদুর বলল, 'মুসলিম লীগ আমার মাথা খারাপ করেনি ডাক্তারবাবু, মাথা খারাপ করিয়েছে হিন্দুদের অত্যাচার। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, এখানে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান! কিন্তু রাজা হিন্দু, অফিসার হিন্দু, মুন্সিরমাল থেকে শুরু করে পাটোয়ারী পর্যন্ত সবাই হিন্দু। সারা রাজ্যে একজন মুসলমান ডাক্তারও নেই।'

বাপী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমার রুজি-রোজগার দেখেও তোমার চোখ টাটাচ্ছে?'

'রুজি-রোজগারের প্রশ্ন নয়, এটা নীতিগত প্রশ্ন।' বাহাদুর আলি খাঁ চোখ নামিয়ে কথাটা বলল।

'আমাদের রাজাসাহেব এখন তোমার চক্ষুশূল! আর তিনিই কি-না তোমায় জলপানি দিয়ে লাহোর পাঠিয়েছিলেন!'

'জলপানি দিয়ে তিনি তো আমায় প্রতি দয়া করেননি, কর্তব্য পালন করেছেন।'

'হিন্দু রাজা তোমায় কাঁটার মতো বিঁধছে, তাই না! কিন্তু হায়দ্রাবাদের বাদশার তো দিনরাত প্রশংসা করে বেড়াচ্ছ। সেখানে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছে, তার নিন্দা তো তোমরা করছ না, তোমাদের খবরের কাগজগুলোও করছে না।'

'আমাদের বাদশা সুবিচার ও ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। তাঁর বিরুদ্ধে খবরের কাগজে যা ছাপা হয়, তা সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুদের মন-গড়া কাহিনী। ও সবের তক্‌যিব্‌ (প্রতিবাদ) করা আমাদের কর্তব্য।'

'তক্‌যিব্‌! তক্‌যিব্‌! কি বললে তুমি, তক্‌যিব্‌? লাহোর থেকে তুমি খুব উর্দু শিখে এসেছ! বলে রাখছি, তোমার এই মুসলিম লীগ পলিসি আমাদের এ রাজ্যে চলবে না। যদি কোনো দিন রাজাসাহেব তোমার এই কীর্তিকলাপ জানতে পারেন, তাহলে কান ধরে বার করে দেবেন তোমায়।'

'আমি চলে যাব; আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে। কিন্তু আমি আমার জাতির সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পারব না। খুব অত্যাচার করে নিয়েছেন আপনারা, এখন আপনাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

বাপী রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'বদমাশ, যে-থালায় খাও সেই থালাকেই ফুটো করো!'

'যে থালার কথা আপনি বলছেন, সে-থালায় যে শুধু ফুটো আর ফুটো। ফুটো ছাড়া তাতে এক গ্রাসও খাবার নেই।'

'নেমকহারাম মুসলিম লীগী!'

'হারামী আর্যসমাজী।'

হঠাৎ বাহাদুরও আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত-পা নেড়ে আস্ফালন করতে লাগল সে। বাপী বেশ তাগড়া, কিন্তু বাহাদুর আলিও কিছু কম তাগড়া নয়। বরং বাপীর চেয়ে অনেক কম বয়েস। বেশ জোয়ান এবং বলিষ্ঠ শরীর। সে জন্যে বাপীর এক ঘুষির বদলে সে দু' ঘুষি চালায়। মা চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। এমন সময় বাড়ির দু'তিন জন চাকর দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো। চেষ্টা-চরিত্র করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিলো তারা।

দু'জনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রাগে কাঁপছেন আর ফুঁসছেন। একজন আরেক জনের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন পারলে কাঁচা গিলে খান।

বাপী হাত তুলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।'

বাহাদুর আলি দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। এখন তার সামনে বাপী ছাড়াও দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে। এ বার যে ভালো রকম লড়াই জমবে, সেটা তার অজানা নয়।

তার রাগ ক্রমশ বাড়ছে। তখনো উত্তেজনায় মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে। সে একটা লাঠিসোটার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল কিন্তু হাতের কাছে সে রকম কিছু না পেয়ে দু'হাতে চায়ের সেট্‌-টাই তুলে নিয়ে রাগের চোটে সেগুলোকে মেঝেতে আছাড় মারল।

ঝন্‌ঝন করে শব্দে সমস্ত পেয়ালা-পিরিচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। তারপরই বাহাদুর বারান্দা থেকে নেমে চলে গেলো।

বাপী খুব চড়া স্বভাবের লোক ছিলেন। যেমন রাগী, তেমনি হঠকারী। তবে তাড়াতাড়ি রেগে যেতেন ঠিকই, কিন্তু তক্ষুনি আবার রাগ পড়ে যেত। বাহাদুর চলে যেতেই তিনিও হাসপাতালে চলে গেলেন। দুপুরবেলা খাওয়ার সময়ও নীচে এলেন না। খেতে আসবেন না, সে কথা বলে পাঠালেন। মা তো রাগে জলেপুড়ে মরছেন। বাহাদুর নামক মুসলমানটাকে গাল পাড়ছেন।

সন্ধ্যের বাপী যখন বাংলোয় ফিরলেন, তখন মা রাগে-তাপে প্রায় কেঁদে ফেললেন 'এই জন্তেই বলেছিলাম, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষো না।'

বাপী নিতান্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি তো ওকে সাপ বলে ভাবিনি, এক অনাথ মনে করেই সাহায্য করেছিলাম। তখন কি আর জানতাম যে আমার সঙ্গেই মারপিট করার জন্তে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে? আমি ওর ভালোর জন্তেই সব কিছু করেছিলাম।'

'এই মুসলমানরা কখনও কারোর দোসর হয় না। তুমি রাজাসাহেবকে বলে ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দাও। এক্ষুনি।'

'হুম্‌...! না, কারোর রুজি-রোজগারে লাথি মারা ঠিক হবে না।'

মা তেলে-বেগুনে জলে উঠে বললেন, 'তোমার এই নরম স্বভাব দেখে মরে যাই আমি! কিন্তু বলো তো, এখন কি করবে?'

'কিছু একটা করতেই হবে। তবে খোকাকে ও স্কুলে পাঠাব না। লোকটার মনে দারুণ ঘৃণা। ঘৃণা কম-বেশী সকলের মনেই রয়েছে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড ঘৃণা...!' বাপীর শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করলেন।

'তোমার সবই দার্শনিকদের মতো কথাবার্তা!' মা হতাশ গলায় বলে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

মা উঠে ভেতরে চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাজা আলাউদ্দিন সাহেব এলেন। সাদা দাড়িওয়ালা ধবধবে ফরসা চেহারার বুড়ো। কাঠবিড়ালীর মতো ছোট ছোট দাঁত, দারুণ সাদা। চোখ দুটো যেমন খুদেখুদে, তেমনি উজ্জ্বল। মেজাজ সব সময়ই সপ্তমে চড়ে থাকে। রাজাসাহেবের এক নম্বরের মোসাহেব। ভীষণ তোষামোদপ্রিয় লোক। নরম গলায় মিষ্টি সুরে কথা বলেন। যখনই আসেন, আমায় কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন। পকেট থেকে পুরো একটা টাকা বার করে হাতে দেন। খাজা সাহেবকে আমার দারুণ পছন্দ।

এ কথা সে কথার পর খাজা সাহেব বাপীকে বললেন, 'আপনি যদি বলেন, তাহলে কথাটা রাজাসাহেবের কানে...।'

কিন্তু বাপী তাঁর কথাটা শেষ করতে দিলেন না। তাড়াতাড়ি বললেন, 'যেতে দিন। আমারও দোষ ছিল। সে যে একটা কম বয়েসী যুবক, সেটা খেয়াল করিনি। বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলাম গালাগালিও দিয়েছিলাম।'

'বন্ধুদের এই অধিকারটুকুও যদি ছোটকা না মানে, তবে তাকে অসভ্যতা ছাড়া কি বলা যায়! শুধু আপনার চোখের একটু ইশারাই যথেষ্ট, যদি...'

বাপী আবার কথার মাঝখানে বলে উঠলেন, 'না-না।'

খাজা সাহেব স্তিমিত গলায় বললেন, 'আশ্চর্য! দুনিয়াটা আস্তে আস্তে কোথায় যাচ্ছে বলুন তো? আমাদের রাজাসাহেব তো বলতে গেলে ধর্মরাজ। তাঁর রাজ্যে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হিন্দু মুসলমান উভয়কেই এক চোখে দেখেন। তাঁর একটা চোখ হিন্দু তো অন্য চোখটা মুসলমান।'

'নিশ্চয়ই —নিশ্চয়ই।'

খাজা সাহেব তাঁর কথার প্রসঙ্গ টেনে বললেন, 'গত বছর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি এক-চতুর্থাংশ খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। দু' হাজার গরিব মুসলমানকে অন্নদান করেছিলেন। এখান থেকে বড় শহর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা তৈরি করার জন্যে শত শত চাষীকে দু' মাস ধরে সরকারী ব্যয়ে কাজ দিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

'আর আপনার মতো এমন একজন নমস্য শিক্ষিত ভদ্রলোকের ওপর সে কি-না হাত তুলল? আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, আপনি চুপ করে বসে আছেন কি করে! আপনার জায়গায় যদি আমি হতাম, জ্যান্ত কবর দিতাম ওকে। শয়তানটার এমন দুঃসাহস যে আপনার গায়ে হাত তোলে! ওর হাত দু'খানাই কেটে ফেলা উচিত। সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু —আল্লার নামে বলছি, আপনার সুখ্যাতি করে শেষ করা যায় না। আমার তো এই সত্তর বছর বয়েস হলো, জীবনে সজ্জন ও বন্ধুবৎসল হিন্দু কম দেখিনি। কিন্তু আপনার মতো এমন পুণ্যাত্মা অদ্যাবধি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।'

'আমি আপনাদেরই একজন সামান্য সেবক!' বাপী খুশি হয়ে বললেন।

খাজা সাহেব চোখ টিপে বললেন, 'ওপরে যাবেন একটু? রাজাসাহেব এক বোতল শ্যাম্পেন কৃপা করেছেন। ভাবলাম, দিন কালই এমন, চারদিকে শুধু হিংসুটের দল, একমাত্র আপনার মতো বন্ধু পেলেই এক সঙ্গে বসে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়।'

'চলুন চলুন।' বাপী তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'আরে ও হামিদ, দুটো মুরগী বেশ ভালো করে কষে ওপরে নিয়ে যাস।'

তারপর তিনি খাজা আলাউদ্দিন সাহেবের হাত ধরে ওপরে চললেন। যেতে যেতে গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, 'বাঁশি যখন বেজে ওঠে কুঞ্জবনে...'

বাপী চলে যেতেই মা জলে উঠলেন। হামিদকে বললেন, 'শুয়োরের কলজে রান্না করে নিয়ে যা। হতচ্ছাড়া এ বাড়িতে অজাত-বেজাত ছাড়া কেউ আসেই না!'

চাকরদের মধ্যে হামিদ বেশ ঠোঁট-কাটা আর সাহসী। সে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'শুয়োরের কলজে আপনিও তো খাবেন মা-ঠাকরুন?'

'হায় রে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া!' মা একটা ছড়ি নিয়ে মারতে যান তাকে। হামিদ হাসতে হাসতে সেখান থেকে কেটে পড়ে।

এ সব ঘটনায় যদি কেউ দারুণ খুশি হয়ে থাকে, তবে সে আমি। এই ঝগড়া-ঝাঁটির ফলে আমায় স্কুল যেতে হলো না। সে জন্তে আমি খুব খুশি, আর সমস্ত ব্যাপারটা তারাকে বলতে সে-ও খুব খুশি হলো। সে সময় আমাদের ওই এলাকায় মেয়েদের কোনো স্কুল ছিল না বলে তাকে স্কুল যেতে হতো না। তাই আমাকেও স্কুল যেতে হবে না জেনে তার খুশি হওয়ার কথা। আমার স্কুল যেতে হলে তার রোজকার খেলার সঙ্গীটি হাতছাড়া হয়ে যায়। তারার আনন্দ ধরে না, সে তার পকেট হাতড়ে আধখানা ভুট্টা বার করে আমার হাতে দিলো। গতবারের ভুট্টা, আর গতবারই ভুট্টাগুলো পুড়িয়ে একসঙ্গে দড়িতে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছিল। বেজায় কুড়কুড়ে আর মিষ্টি। আমি ভুট্টা খেতে খেতে তারার ওপর আমার বিদ্যে ফলানোর জন্তে বললাম, 'জানিস, হায়দ্রাবাদের রাজা মুসলমান!'

'মিথ্যে কথা।' তারা আমার হাত থেকে ভুট্টা কেড়ে নিয়ে বলল, 'রাজা তো হিন্দু হয়। আর যারা মুসলমান, তারা সব গরিব।'

'না। সে মুসলমান আর স্থায়ের পুতুল।'

'একেবারে বাজে কথা। পুতুল তো মাটির হয়, পাগল!' তারা এমন বড় বড় চোখে আমায় চেয়ে দেখছিল, যেন আমি নেহাতই বোকা। তারপর হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'স্থায় কি রকম জিনিস?'

'এক রকমের মাটি।' আমি তারার হাত থেকে ভুট্টা কেড়ে নিয়ে জানালাম, 'আর সেই কালো মাস্টারটা বলছিল —আমি আমার জাতির সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পারব না।'

তারা আবার জিজ্ঞেস করল, 'জাতি? জাতি কাকে বলে?'

আমি বললাম, 'যেমন তুই আমার জাতি।'

'তা কি করে হবে? বাঃ, বেশ তো, আমি তোমার জাতি হলাম কি করে মশাই? বাঃ বাঃ!'

'কারণ আমি তোর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পারব না।'

'বাঃ, তুমি আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পার না, বুঝি? সে দিন চালে কুল পাড়ার সময় তুমি একাই কুড়িটে কুল খেলে, আর আমায় দিলে মোটে সাতটা। —তাহলে আমি তোমার জাতি হলাম কি করে? না মশাই, তোমার জাতি-টাতি হব না। কিছুতেই না —কক্ষনো না।'

এ কথা বলে তারা আমার ওপর চটে গিয়ে সরে বসল। সত্যিই রেগে গেছে সে, অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। আমি তার ঘাড় ধরে জোর করে আমার

দিকে তার মুখ ফেরালায়, সত্যিই তার চোখে জল। আমি একটু দমে গেলাম। বললাম, 'আচ্ছা, আজ চালে চল। কুল পেড়ে সব তোকে দেবো। আজকের সব কুল তোর। তাহলে তো আমার আড়ি হবি ?'

তারা খুশি হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর হাততালি দিতে দিতে চালের দিকে ছুটল।

আমিও তারার পেছনে পেছনে দৌড়লাম।

চালের দুরবিগম্য একটি জায়গায় কুল গাছের কাঁটাঝোপ। ঝোপের মধ্যে কাদচে লাল রঙের কুল পেকে টুসটুস করছে, যেন আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। আমি একটা চাটান থেকে অন্য একটা চাটানে যেতে যেতে, কুল গাছের একটা বড় ডালের ছায়ায় তারাকে ধরে ফেললাম।

তারা সরল চোখে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ?'

বললাম, 'আমায় একটা কিস্ দে।'

'কিস্ আবার কি ?'

'কাল দেখি, বাংলোর পেছন দিকে হামিদ বেগমকে ধরে কথাটা বলছে।'

তারা একটা ডালের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে নির্বিকার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বেগম কি বললে ?'

'বেগম বললে —আমি চেঁচাব, চেঁচিয়ে হাট্ট করব। দেবো না আমি।'

তারা বলল, 'বুঝেছি। দুষ্টু হবে হয়তো।'

'নারে পাগলী ! বেগম 'দেবো না' বলতেই হামিদ তাকে জোর করে চেপে ধরল, তারপর জবরদস্তি করে তার মুখে মুখ গুঁজে দিলো। জানিস, আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি পায়রাগুলোকে অমনি করতে দেখেছি। তারপর, অনেকক্ষণ পর, হামিদ বেগমের মুখ থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নিল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'খুব মিষ্টি' —এই হলো কিস্, বুঝলি ?'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'কিস্ মিষ্টি হয় বুঝি ?'

'হামিদ তো তাই বললে !'

'দেখো তো।'

তারা একেবারে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি হামিদের মতো করে তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর তার মুখে মুখ গুঁজে দিলাম। তারা হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরে গেলো। তিড়বিড় করে লাফাতে লাফাতে বলল, 'থুঃ —থুঃ, মিষ্টি কোথায় ! একেবারে তিতে।'

আমিও থুতু ফেলতে ফেলতে আশাহত কণ্ঠে বললাম, 'হুঁ, একেবারে তিতে। আর তোর মুখ থেকে তুষ্টীর গন্ধ বেরোচ্ছে।'

'আর তোমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না ?' তারা জোরে থুঃ থুঃ করতে করতে বলল।

'বড়রা সবাই কি রকম মিথ্যেবাদী আর ফাঁকিবাজ হয়, দেখেছিস!'

তারা রাগে ও ক্ষোভে বলে, 'ঠিক বলেছ।'

'ওদের স্বভাব কেমন নোংরা! আর ওরা আমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের বলে কি-না নোংরা। নে, কুল খা...'

আমি তাড়াতাড়ি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কুল পাড়তে লেগে গেলাম। কুল পেড়ে পেড়ে তারার আঁচলে ফেলে দিই। তারার আঁচল পাকা টুলটুলে কুলে ভর্তি হয়ে উঠতেই সে বিরক্তির ভাণ করে বলে, 'বাস্, ছেড়ে দাও এ বার।'

তারপর সে তার আঁচল থেকে একটা কুল নিয়ে আমার মুখে গুঁজে দিয়ে বলে, 'খাও।'

জীবনে অনেক কুল খেয়েছি, রসে টইটম্বুর কুল। মধু খেয়েছি। পাতলা নরম গোলাপী ঠোঁটে চুমু খেয়েছি। এমন কুলও খেয়েছি, যা দেখতে স্ফটিক-স্বচ্ছ গায়ে মাখা সাদা ননীর মতো। কিন্তু সেই একটি কুলের মতো মধুর স্বাদ আজ পর্যন্ত কোথাও পাইনি।

সেই ঘটনার পর বাহাদুর আলি খাঁর সঙ্গে বাপীর একদম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেলো দু' জনের মধ্যে। এক সপ্তাহ পরে স্কুলে যখন পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হলো, বাপী সেই সভায় গেলেন না। এর আগে প্রত্যেকবারই যেতেন; আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ভারি সুন্দর সভা হয়। উঠোনটাকে গেরুয়া রঙের সামিয়ানা আর ক্যান্‌ভাস দিয়ে সাজানো হয়। চারদিকে পতাকা উড়তে থাকে। অনেক দূর পর্যন্ত পুলিশ-মিলিটারি রাস্তার দু' দিকে সার বেঁধে দাঁড়ায়। যখন রাজাসাহেবের গাড়ি আসে, তখন রাজকীয় ব্যাণ্ড বাজতে শুরু করে জোরে জোরে। পুলিশ-মিলিটারির সবাই অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। রাজাসাহেবের চমৎকার গাড়িটাকে সালাম করতে থাকে। গাড়িটার ভারি জাঁকজমক। কোচওয়ানটারও সাজগোজ কম নয়। মাথায় তেরচা করে পরে থাকে রাজপুতী পাগড়ি। গায়ে থাকে সোনালী-রুপোলী কাজ করা কোট। হাতে চাবুক নিয়ে যখন সে চার ঘোড়ার গাড়ির সবচেয়ে উঁচু সিটে বসে থাকে, তখন তার জমকালো পোশাকে ও বাহারে গোঁফে তাকে রাজাসাহেবের চেয়েও ওপরের লোক বলে মনে হয়। তারপর স্কুলের প্রাঙ্গণে রাজাসাহেবকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র রাজাসাহেবের প্রশস্তি-গাথা আবৃত্তি করে। বরাবর একই আবৃত্তি করা হয়। কবিতাটিতে রাজাসাহেব ও তাঁর সাত পুরুষের গুণগান থাকে। কবিতা আবৃত্তির পর রাজাসাহেব প্রতি বছরই ছাত্রটিকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেন। তারপর হেডমাস্টার সবিনয়ে রাজাসাহেবকে যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাতে জানাতে স্কুলের রিপোর্ট পেশ করেন, এবং রিপোর্টের শুরুতে ও শেষে সরকারের জীবন ও ধনসম্পদের মঙ্গল কামনা করা হয়। একত্রিশটি তোপধ্বনি যারা ইংরেজ সরকারের দরবারে তাঁর পদমর্যাদা ও গৌরব ঘোষণা করা

হয় এবং উত্তরোত্তর আরও উন্নতি প্রার্থনা করা হয়। তারপর রাজাসাহেব সোনার হরফে ছাপা তাঁর উপদেশ-বাণী পাঠ করেন। সেই ভাষণ-পত্রে জাফরান ছড়ানো থাকে। কণ্ঠস্বর এত মৃদু ও মিহি যে শুনলে হাসি পায়। কিন্তু সমস্ত ছেলে হাসি চেপে মাথা হেঁট করে তাঁর বাণী শোনে। ভাষণ পাঠ শেষ হলে রাজাসাহেব স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। তখন সেকেণ্ড মাস্টার একটি নামের তালিকা নিয়ে একজন করে ছেলের নাম পড়েন, নাম শুনে হেডমাস্টার সামনের বড় টেবিলে সাজিয়ে-রাখা পুরস্কারগুলো থেকে সঠিক পুরস্কারটি নিয়ে রাজাসাহেবের হাতে তুলে দেন। ছেলেটি উঠে এসে দু'হাত পেতে পুরস্কার নিয়ে মাথা হেঁট করে বলে, 'জয় মহারাজ'। তারপর পুরস্কারটি সে বুকে চেপে ধরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার ক্লাসের ছেলেরা যেখানে বসে থাকে, সেখানে ফিরে যায়।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে রাজাসাহেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যে আবার ব্যাণ্ড বাজতে থাকে। রাজাসাহেব নিজের গাড়িতে চেপে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর চলে যাওয়ার পরই ছেলেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ শুরু হয়। সে সময় স্কুলে যারা পড়ে না সেই সব ছেলেরাও স্কুলের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে মিষ্টির লোভে। রঙ বেরঙের পতাকাগুলো মাটিতে গড়াগড়ি যায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই অমন সাজানো-গোছানো উঠোনটা মাঠের মতো খাঁ-খাঁ করে। সে সময়টা আমাদের মতো ছোটদের পক্ষে ভারি চমৎকার। এরই জন্যে তো এক বছর ধরে আমরা সবাই প্রতীক্ষা করি।

কিন্তু সে বারে বাণী সভায় গেলেন না। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, আমাকেও যেতে দিলেন না। আমি তো গোঁ ধরে ভীষণ কান্নাকাটি করলাম, ধুলোয় গড়াগড়ি দিলাম, স্নান করতে চাইলাম না, তবু কেউ কর্ণপাত করল না আমার কথায়। সভায় যাওয়ার জন্যে আমার এ রকম জিদ দেখে মা খাটের পায়ার সঙ্গে আমায় দড়িতে বেঁধে রাখলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম সেখানেই। তাতে বুঝি মা-র মনে দয়া হয়েছিল। তিনি আমায় কোলে তুলে নিয়ে আদর করে মুখে চুমু খেয়ে খাটে শুইয়ে দিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। কারণ কেঁদে কেঁদে তখন আমি ভীষণ ক্লান্ত।

বাণী রাজাসাহেবের কাছে কোনো রকম অভিযোগ করেননি। তবু শুনেছি রাজাসাহেবের কানে না-কি রাজদ্রোহিতার প্রচুর অভিযোগ উঠেছে।

সভায় অংশগ্রহণের অব্যবহিত পরেই রাজাসাহেব শেখ্ পার্বত্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে শিকার করতে গেলেন।

অজড় নালার পশ্চিম তীর থেকে হাতার পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত জঙ্গলটা বিস্তৃত। এ জঙ্গলে রাজাসাহেব ছাড়া অন্য কারোর শিকার করা নিষেধ। গাছ কিংবা গাছের ডালপালা কাটাও বারণ। সে জন্যে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার অবাধে ঘুরে বেড়ায়। চিতাবাঘ, ভালুক, শূকর, হরিণ প্রভৃতি নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে খেলা করে।

প্রায়ই তারা ওপর থেকে নীচে নেমে এসে চাষীদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, গবাদি পশু হত্যা করে। কিন্তু জঙ্গলটা যেহেতু রাজাসাহেবের খাস মৃগয়াভূমি, সে জন্তে কেউ কোনো অভিযোগ করতে সাহস পায় না। অজক নালার পূর্ব তীরে বাহাদুর আলি খাঁর দুটি আটাকল। খুব চালু, এলাকার সমস্ত গম পেষাই হয় ওই আটাকল দুটিতেই। বাহাদুর আলির কর্মচারী ওগুলো দেখাশোনা করে। সাধারণত গম ভাঙাতে আসে মেয়েরা। ভেড়ার চামড়ার থলিতে গম ভরে মাথায় করে নিয়ে আসে। পেষাইয়ের কমিশন বাবদ কিছু গম বা আটা দিয়ে গম ভাঙিয়ে যায় তারা। আটাকল দুটির কাছেই বাহাদুর আলির স্ত্রীর ধানক্ষেত। ধানক্ষেত থেকে কিছু দূরে বাহাদুর আলির বাড়ি। বাড়ির সামনে উন্নাব ফলের গাছ, আড়ু-নাশপাতির গাছ। বাড়ির পেছনে রয়েছে আখরোটের বড় বড় দুটি গাছ, দুপুরবেলা সেই গাছের ছায়ায় বাহাদুর আলির গরু ছাগল ভেড়াগুলো বিশ্রাম করে।

যে দিন রাজাসাহেব তাঁর সেই মৃগয়াক্ষেত্রে শিকারে গিয়েছিলেন সে দিনই সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালের কাছে ভীষণ হৈ-হট্টগোল শুরু হলো। গোলমালটা কিসের, দেখার জন্তে আমি তক্ষুনি দৌড়তে দৌড়তে হাসপাতালের গেটে হাজির হলাম।

বেশ ভীড় সেখানে। কয়েক জন শিকারীও রয়েছে, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়েই চলে এসেছে তারা। কারো হাতে জলন্ত মশাল, কারণ পাহাড়ী এলাকায় সন্ধ্যের মুখেই বেশ ঘন অন্ধকার হয়ে যায়। কয়েক জন লোক খাটিয়ায় করে একজন আহত লোককে কাঁধে তুলে নিয়ে আসছে। চারদিকে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস করে কথাবার্তা চলছে। সে সব কথা আমার আদৌ বোধগম্য হচ্ছিল না। গেট পেরিয়ে লোক-গুলো রাস্তা ধরে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে চলল। সিঁড়ি ভেঙে হাসপাতালের বারান্দায় উঠে কাঁধ থেকে খাটিয়া নামিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল তারা। দেখলাম আহত লোকটার গা থেকে রক্ত ঝরছে। লোকটা বাহাদুর আলি ছাড়া অন্য কেউ নয়।

ইতিমধ্যে বাপীর কানেও খবর পৌঁছে গেছে। তিনি দৌড়তে দৌড়তে হাসপাতালের বারান্দায় এসে হাজির হলেন। বাহাদুরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে অপারেশন রুমে নিয়ে যেতে বললেন। চার জন আর্দালি এসে অজ্ঞান অচৈতন্য বাহাদুরকে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে গেলো। আমিও অপারেশন রুমে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাপী আমায় ধমক দিয়ে একেবারে হাসপাতাল থেকেই তাড়িয়ে দিলেন।

বাপীর ধমক খেয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে বাংলোয় ফিরে এলাম বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকল হাসপাতালেই।

অনেক রাত পর্যন্ত বাপী অপারেশন রুমে ছিলেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে ফিরলেন তিনি। আমি তখন খেয়ে-দেয়ে মা-র বিছানায় শুয়ে পড়েছি। খুব ঘুম আসছিল, কিন্তু জোর করে চোখ মেলে চেয়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিলাম।

বাপী এসে গরম জলে স্নান করলেন। খাওয়া-দাওয়া সারলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে আলবোলা টানলেন। তারপর কাপড়-চোপড় বদলে শোবার ঘরে এলেন। প্রথমে তো তিনি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন বিছানায়। মা-ও চুপ করে রইলেন। বাপীর ভাবগতিক বোঝেন তিনি। এটাও জানেন যে, বাপী নিজে থেকেই সব কথা খুলে বলবেন।

কিছুক্ষণ কাটল। কিন্তু আমার কাছে সময়টা বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। বাপী ফিরে শুলেন। তারপর মা-র খাটের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কাকার মা, ঘুমোলে ?'

'উঁ...ম্‌না...' মা লেপের তলা থেকে মুখটা সামান্য বার করে বললেন, 'কি বলছ ?'

বাপী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, 'কাকা ঘুমিয়েছে, না জেগে আছে ?'

'ও বেচারী তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু আমার চোখে আর এক ফোঁটাও ঘুম নেই। লেপের তলা থেকে মুখখানা একটু বার করে রেখেছি, যাতে কথাবার্তাগুলো ঠিকমতো শুনতে পাই। কিন্তু লেপের তলায় নড়া-চড়া একদম বন্ধ করে পাথরের মতো নিঃসাড়ে শুয়ে রয়েছি।

'বাহাদুরের দারুণ চোট লেগেছে, জানো ?'

'না তো!' মা না জানার ভান করে বললেন, যদিও অনেকটাই জানেন তিনি।

'হ্যাঁ, মারাত্মক জখম হয়েছে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।'

'যেমন কর্ম, তেমন ফল!' মা একটু চড়া গলায় বললেন।

'জানো, বাহাদুর কি করে জখম হলো ?'

'আমি তো মেয়ে মানুষ। সারা দিন ঘর-সংসার নিয়ে আছি। আমি কি করে জানব ?' মা নিতান্তই সরল কণ্ঠে বললেন।

বাপী বিছানায় মা-র দিকে আরও কিছুটা সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'এ সব রাজাসাহেবেরই কীর্তি।'

'আস্তে বলো।' মা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন যেন।

'ধ্যাৎ, এখানে কে আর শুনতে আসছে ?' বাপী বেশ একটু জোরে বলে উঠলেন।

'রাজাসাহেব কি করেছেন ?'

'শুনলাম, রাজাসাহেবের শিকার-হাঁকানো লোক কম পড়েছিল। অমড় নালার আশপাশে যত বাড়ি আছে, শিকার হাঁকানোর জন্যে তিনি প্রত্যেক বাড়ি থেকে লোক ডেকে নিতে হুকুম দিলেন। বাড়ির সমস্ত জোয়ান লোককেই শিকার হাঁকাতে যেতে হবে। হুকুম পেয়েই ক্যাপ্টেন গজেন্দ্র সিং চার জন সেপাই নিয়ে বাড়িগুলোতে চড়াও হলো। বাহাদুর তখন কাপড়-চোপড় পরে স্কুল যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সে ক্যাপ্টেন গজেন্দ্র সিংকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল যে, সে একজন সরকারী কর্মচারী, স্কুলের হেডমাস্টার, তার পক্ষে হাঁকিয়ের কাজ করা সম্ভব নয়। জীবনে সে কখনও এ কাজ করেনি। তাকে এ ধরনের অসম্মানের কাজ করতে বাধ্য করাটাও উচিত নয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন গজেন্দ্র সিং কিছুতেই তা মানতে রাজী হলো না। বাহাদুর একটু চঁ্যা-কোঁ করতেই ক্যাপ্টেন তার ওপর রাইফেল তাক করল।'

'হায় রাম! হায় পরমেশ্বর! তুমিই সকলের রক্ষক। তোমারই আশ্রয় নেয় সকলে। —হ্যাঁ, তারপর কি হলো?'

'সেপাই চার জন গাঁয়ের অন্যান্য লোকের সঙ্গে বাহাদুরকেও ধাক্কা মারতে মারতে জঙ্গলে নিয়ে গেলো। হাঁকিয়েদের মধ্যে ভিড়িয়ে দিলো তাকেও। যে দলটায় বাহাদুর রয়েছে, সেই দলটার ওপর নজর রাখার জন্যে ক্যাপ্টেন গজেন্দ্র সিং একজন সেপাইকে দায়িত্ব দিলো। বলে দিলো, বাহাদুর যদি পালানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথায় বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি মারে।'

'তারপর?'

'বাহাদুর তো হাঁকিয়েদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো। গজেন্দ্র সিং তাকে খালি পায়েই বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। সে জন্যে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কাঁটায় আর ঝোপঝাড়ে তার পা ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে —তবু সেপাই তাকে ছাড়ে না। তবে হ্যাঁ, বাহাদুর একটা সুযোগ পেল। রাজাসাহেব যখন একটা চিতাবাঘকে গুলি করলেন তখন সারা জঙ্গলে রাজাসাহেবের নামে জয়ধ্বনি উঠল। সেই সময় সেপাইটার একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বাহাদুর দল থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেপাইটাও ভারি চতুর। শুনছি, সে না-কি বাহাদুরকে গুলি করেছিল।'

'হা রাম, হা কৃষ্ণ, হা পরমাত্মা! তোমারই ভরসা ঠাকুর, তোমারই ভরসা। তুমিই সকলের প্রভু, সকলের পালক। —তারপর কি হলো?'

'কেউ বলছে, গুলি খেয়েও বাহাদুর না-কি দৌড়ে পালাচ্ছিল। কেউ বলছে, সেপাই গুলি করেনি, গুলি করেছিলেন রাজাসাহেব নিজেই। যাই হোক না কেন, এটা তো ঠিক যে, কেউ না কেউ তার পায়ে নিশ্চয়ই গুলি করেছে। এটাও ঠিক যে, গুলি খেয়েও বাহাদুর দৌড়ে পালাচ্ছিল। এমন সময় উল্টো দিক থেকে একটা বুনো শুয়োর এসে পড়ল সামনে। যে দিক থেকে হাঁকিয়েরা শিকার হাঁকাচ্ছিল সে দিক থেকে শুয়োরটা বেরিয়ে রাজাসাহেবের মাচার দিকে তীব্রবেগে ছুটে যাচ্ছিল। বাহাদুর কোনো দিকে সরে পড়ার সুযোগই পেল না। প্রথম আক্রমণেই সে ধরাশায়ী হলো। শুয়োরটা তার ধারাল দাঁত দিয়ে ঘাড় থেকে সারা শরীরটা ফেড়ে দিলো একেবারে।'

'দুগ্‌গা —দুগ্‌গা! আমার খোকাকে ভালো রেখ মা! আমার শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় রেখ! —তারপর?'

'এখন তো ও হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। আমি ওকে বাঁচানোর খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু ও বাঁচবে কি-না জানি না ···আর আমার তো মনে হয়, এখন ওর যা অবস্থা, না বাঁচলেই ভালো।'

'হায় হায়, এমন পাপ কথা মুখে আনতে আছে?'

'বলছি কি আর সাধে। রাজাসাহেব ওর দুই বিবিকেই রাজবাড়িতে তুলে নিয়ে গেছেন।'

'ইস্ মা-গো ···সত্যি? না-না ···সত্যি বলছ তুমি?'

বাপী চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না।

অনেকক্ষণ পর মা বললেন, 'এটা তো জুলুমবাজি, জবরদস্তি···'

তবু বাপীর মুখে কথা নেই।

মা আবার বললেন, 'মা বসুন্ধরার কলজে ফেটে যাবে। কাকার বাব', এটা তো ঘোর অন্যায়।'

তবু বাপীর খাট থেকে কোনো আওয়াজ এল না। খুব সম্ভবত ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

•　　•　　•

বাপীর ধারণা ছিল, বাহাদুর বাঁচবে না। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল, বাহাদুর যেন বেঁচে থাকার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প। প্রথম ছ'সাত দিন তো তার জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানেই কেটে গেল। কখনো বেহুঁশ হয়ে, কখনো মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। কখনো-সখনো এক-আধটু জ্ঞান ফিরে এলে ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জানোয়ারের মতো গোঙায়। তখন বাপী তাড়াতাড়ি ইঞ্জেকশন দিয়ে আবার তাকে অচেতন করে দেন। তার অবস্থা যে খুব খারাপ, ছ'সাত দিনেই সেট গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দেহাতী গরিব মুসলমানগুলো দলে দলে আসে তার খোঁজ খবর নিতে। তাদের পরনে ময়লা লুঙ্গি, ময়লা জামা, কাঁধে ময়লা গামছা। কেউ দুধ নিয়ে আসে, কেউ-বা ফল। কেউ-বা খালি হাতেই আসে। মুখে বলে না কিছু, কিন্তু তাদের অন্তরে অকুণ্ঠ ভালোবাসা, মনেপ্রাণে বাহাদুরের আরোগ্য কামনা করে তারা। প্রথম দিকে দিনে আট-দশ জন করে আসত, তারপর বেড়ে হলো বিশ-ত্রিশ, তারপর পঞ্চাশ —যতই দিন যায়, লোকের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। দেখেশুনে মনে হয়, বাহাদুরের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে তাদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নও জড়িত যেন বাহাদুর বাঁচলে তারা বাঁচবে, বাহাদুর মারা গেলে তারাও মরবে, তাদের সমস্ত স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্নের মতো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তারা কাউকে কিছু বলে না, কিন্তু সকলেই জানে, বাহাদুরের প্রাণরক্ষার জন্যে আজ ঘরে ঘরে প্রার্থনা করছে সবাই।

প্রথম পনেরো-বিশ দিন এক রকম অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটে। তারপর

অবস্থায় পরিবর্তন হয়। মৃত্যুর হিমশীতল দরজা থেকে জীবনের উষ্ণতায় প্রত্যাগমন করে সে। এখন এক-আধটু হাল্‌কা খাবার খায়। আস্তে আস্তে বাপীর সঙ্গে কথা বলে। সবার আগে যে প্রশ্নটি করে, সেটি তার স্ত্রীকে সম্পর্কে। বাপী জানতেন, সে তাদের কত ভালোবাসে। এটাও জানতেন যে, তার জ্ঞান ফিরলে সর্বাগ্রে সে এই প্রশ্নটিই করবে। সে জন্তে তিনি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। বাহাদুর প্রশ্ন করতেই তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'আরে, গুলনারের কানে তোমার খবর যেতেই তার হার্ট-অ্যাটাক হয়। সে এখনো বিছানায় শুয়ে আছে। আমি তাকে বিছানা থেকে উঠতে নিষেধ করে দিয়েছি। লাজ্জাকে ওর দেখাশোনা করতে বলেছি। সে বেচারী দিনরাত হিমসিম খাচ্ছে। তুমি কি বলো, এ অবস্থায় ওদের এখানে আসতে বলব ?'

বাহাদুর বলল, 'না না ডাক্তারবাবু।...গুলনার সেরে উঠবে তো ?'

'কিছু ভেবো না বাহাদুর। সে দায়িত্ব আমার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কারোর সঙ্গে কোনো রকম কথাবার্তা বলবে না। আরাম করো। সেরে ওঠার চেষ্টা করো।'

বাহাদুরের মুখ-চোখের চেহারা যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। দু' চোখ বন্ধ করে বলল, 'আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করব।'

কিন্তু মাঝে মাঝে তার মন হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে এমন চোখে বাপীর দিকে তাকায়, যেন বাপী তার ঘাতক। তিনি ছুরি কাঁচি ইত্যাদি নিয়ে তার বিছানার কাছে এলে, কিংবা তাকে অপারেশন রুমে টেবিলে শুইয়ে দিলে তার চোখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া কাঁপে। সে দিন ঝগড়ার সময় যে সব কথা সে বলেছিল, সে সব তার মনে পড়ে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, গলার কাছে দম আটকে আসে যেন। সে সময় বাপীর নড়াচড়ার প্রত্যেকটি ভঙ্গি, তাঁর ছুরি-কাঁচি নাড়া-চাড়া করা, সব কিছু সে তীক্ষ্ণ সন্দেহের চোখে দেখে, বাপী যেন ডাক্তার নয়, জল্লাদ, তাকে খুন করতে আসছেন। রোজই একবার করে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন সে নিজেকে একটা লাশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। বাপী সব বুঝতে পারেন। বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকেন। বাহাদুর কখনও কিছু জিজ্ঞেস করে না, বাপীও কোনো জবাব দেন না। বাহাদুর যে তাঁকে সন্দেহ করছে এবং সেটা যে তিনি বুঝতে পেরেছেন, বাপীর চোখের দৃষ্টিতে তার এতটুকু আভাস থাকে না। বাহাদুরের অহেতুক সন্দেহের জন্তে তাঁর চোখে কোনো প্রতিবাদও নেই, সান্ত্বনাও নেই। তিনি ভীষণ গম্ভীর হয়ে নিজের কাজ করে যান।

এক মাস সওয়া এক মাস কেটে যাওয়ার পর বাপী একদিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়। রোজ সন্ধ্যের নিয়মিত স্নান করেন, কিন্তু সে দিন স্নান করলেন না, খাবারও খেলেন না। মাথা-যন্ত্রণায় ছাপ করে

বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মা রাণীর মেজাজ-মর্জি বোঝেন, খাওয়ার জন্যে একটু পীড়াপীড়ি করে তিনিও চুপ করে গেলেন। শোওয়ার আগে দু'জনের মধ্যে আর কোনো কথাই হলো না। ঘড়িতে যখন এগারোটা বাজল, তখন রাণী মা-র খাটের দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকার মা, ঘুমোলে?'

মা জবাব দিলেন, 'না, ঘুমোইনি।'

'কাকা ঘুমিয়েছে?'

'ও বেচারা তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে!'

রাণী চুপ করে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে থেমে থেমে বললেন, 'আজ খাজা আলাউদ্দিন এসেছিল।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'রাজাসাহেবই পাঠিয়েছিলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে।'

'কি কথা?'

'রাজাসাহেব বলেছেন বাহাদুরকে শেষ করে দিতে।'

মা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আমার বুকের ধুকপুকুনি যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হয়তো চিৎকার করেই উঠতাম। কিন্তু মুখে হাত চাপা দিয়ে বড় কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলাম।

মা অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। রাণী বললেন, 'খাজা আলাউদ্দিন বলছিল—রাজাসাহেব বলেছেন, বাহাদুরকে জেলে বন্দী করে রাখলে কিংবা গুলি করে মারলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। সে জন্যে ডাক্তারবাবুকে বলো, তিনি যেন ওর ঘাড়ের শিরা কেটে দেন।'

মা যেন জোরে দম বন্ধ করে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

'খাজা আলাউদ্দিন আরও বলছিল যে, এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। যেন স্বাভাবিক মৃত্যু, কেউ কিছু জানতে পারবে না। ছুরির আলতো ছোঁয়া লেগে যদি একটা ছোট্ট শিরা না কেটে ধমনি কেটে যায়, তাতে কার কি সন্দেহ হবে?'

'কিন্তু তুমি তো ডাক্তার! ডাক্তার মানুষ মারে, না বাঁচায়?'

'আমি এ রাজ্যের সরকারী ডাক্তার। রাজদরবার আমায় যথেষ্ট মান-মর্যাদা দিয়েছে। একটা বাংলো দিয়েছে, বাগান দিয়েছে। আমার কাছে দশ একর জমি, দু'জন মালী, পাঁচ জন চাকর রয়েছে। মান-সম্মান আছে, খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। ছুরির একটা আলতো ছোঁয়ায় সবই বজায় থাকতে পারে কাকার মা!'

মা-র মন যেন একেবারে ভেঙে পড়ছে। ধরা গলায় বললেন, 'তুমি কি জবাব দিলে?'

'আমি এক মাস সময় চেয়েছি।'

মা-র সারা শরীর কেঁপে উঠল। লেপের তলাতেও যেন শীত করে জ্বর এল তাঁর। ভয় পেয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। রাণীকে কিছু বললেন না। অল্পক্ষণে

বেড-রুমের দরজা খুলে ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়েই শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে আছড়ে পড়লেন তিনি।

সব কিছু ভুলে আমিও উঠে বসলাম বিছানায়। মাকে ঠাকুর ঘরের মেঝেয় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে কেঁদে ফেললাম। বাপী উঠে এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন। যখন তিনি চুমু খেয়ে আমায় আদর করতে লাগলেন, তখন দেখলাম তাঁর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরছে।

* * *

এক মাসের মধ্যে আর মাত্র একদিন বাকি আছে। সে দিন বাপী ড্রেস করে দেওয়ার জন্যে বাহাদুরের ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে দু'জন কম্পাউণ্ডার, দু'জন আর্দালি। হাতের কাছেই ট্রলির ওপর অপারেশনের সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো। কিন্তু আজ কাজ শুরু করার আগে বাপী সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। সবাই চলে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। নিজের হাতেই ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ খুলতে লাগলেন। বাহাদুরের অনেক ঘা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকটি এখনো সম্পূর্ণ সারেনি।

ঘাগুলো বাপী খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর একটা ছুরি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'বাহাদুর!'

'জী!'

'জানো, গুলনার আর লায়লা কোথায়?'

বাহাদুর অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল। কোনো কথা বলল না।

বাপী বললেন, 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম তোমায়।'

'আমি জানি।'

'কি করে জানলে তুমি? কেউ বলেছে?' বাপী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বলল তোমায়?'

বাহাদুর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কেউ বলেনি, তবু জানি।'

'কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, রাজাসাহেব হুকুম দিয়েছেন, হাসপাতালেই তোমায় শেষ করে দিতে হবে!'

'না না… !' দুর্বল শরীরেই বাহাদুর দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল একেবারে।

'হ্যাঁ, এটা রাজাসাহেবের হুকুম। আর আজকেই তোমার জীবনের শেষ দিন।'

বাহাদুর নিবিড় চোখে ডাক্তারের ছুরির দিকে চেয়ে বলল, 'না না, আপনি তা করতে পারেন না!'

ছুরিটা শূন্যে উঠে রইল অনেকক্ষণ। অবশেষে বাপী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহাদুর, তুমি হাঁটতে পারবে?'

'জানিনে ডাক্তারবাবু।'

'তোমার পিঠের ঘা একরকম সেরে গেছে। বাঁ পায়ের ঘাটাও সেরেছে। শুধু ডান পায়ের ঘা সারতে বাকি আছে এখনো। ডান হাতের কনুইয়ের ঘাটাও অবশ্য ···বাহাদুর, হাঁটতে পারবে তুমি ?'

'বলতে পারছিনে ডাক্তারবাবু। আপনি এই মাত্র যা বললেন, তা শুনে আমার গায়ে তো আর এক বিন্দুও শক্তি নেই।'

'আমি তোমায় একটা সুযোগ দিচ্ছি। আজ সারা রাত তোমার ঘরে কেউ আসবে না। আমি সবাইকে বলে দেবো যে, ওষুধ দিয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। তোমার ঘরে অন্য কেউ আসবে না। তাছাড়া ঘরের বাইরে যে আর্দালি-ডিউটি দেয়, তাকেও কোনো ছল-ছুতো করে আমার বাড়িতে ডেকে পাঠাব। রাতের অন্ধকারে তুমি যদি ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের পশ্চিম কোণটায় গিয়ে কোনো রকমে পৌঁছাতে পার, তাহলে সেখানে তোমার দোস্তের দেখা পাবে। ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করবে সে।'

বাহাদুরের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। সে জোরে বাপীর হাত চেপে ধরে বলল, 'ডাক্তারবাবু···ডাক্তারবাবু···এ-কি বলছেন আপনি !'

'আমি শুধু বলতে চাই যে, পৃথিবীতে এ রাজত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। যে দিন তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়, সে দিন যেমন আমি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বিরুদ্ধে ছিলাম, আজও তেমনি। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ এ কথাও বলব যে, কোনো মুসলমানের ওপর কোনো হিন্দুর কিংবা কোনো হিন্দুর ওপর কোনো মুসলমানের অত্যাচার করবার অধিকার নেই। কোনো মানুষের ওপরই আরেক জন মানুষের অত্যাচার করার অধিকার থাকতে পারে না। আমার পেশাই আমাকে মানুষের জীবনকে সম্মান করতে শিখিয়েছে ···আর যে তোমার মর্যাদা লুণ্ঠন করেছে, তার বিরুদ্ধে সব রকম লড়াই করার অধিকারও রয়েছে তোমার।'

কথাগুলো বলেই বাপী টেবিলের ওপর ট্রে-তে ছুরিখানা রেখে দিলেন। তারপর মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে বাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা জলযোগ সেরে আমি ইংরেজি এ-বি-সি বইখানা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলাম। মাকে বললাম যে, আমি কালকের পড়াটা বাগানে আলুবোখারার গাছের তলায় বসে বসে মুখস্থ করছি। এক মাস থেকে বাপী আমায় রোজ ইংরেজি পড়ান। আগে থেকেই বাপী বাড়িতে আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতেন, ইংরেজিতে জবাব দেওয়া শেখাতেন। তাঁর সেই চেষ্টা চরিত্রের ফলে এখন আমি এই অল্প বয়েসেও ছোটখাটো প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে বেশ গড়গড় করে দিতে পারি। আমাদের বাড়িতে যে সব অফিসার অতিথি হিসেবে আসেন, আহারাদির সময় তাঁদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমিও ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করি। আমার কথা শুনে তাঁরা হতবাক হয়ে যান, আর আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে যাই একেবারে !

ইংরেজিতে কথা বলা তো অনেক আগেই শিখেছি, কিন্তু আমার কেতাবী বিদ্যেটা একেবারেই ছিল না। মানখানেক হলো, বাপী আমায় ইংরেজি বর্ণ পরিচয়ের একখানি চমৎকার বই এনে দিয়েছেন। প্রত্যেক পাতায় রঙ-বেরঙের ছবি। আজকাল আমি সেই বইখানাই পড়ছি।

মা আমার কথা শুনে বললেন, 'তাহলে ওই আলুবোখারার গাছের তলাতেই বসে বসে পড়ো। এদিক-ওদিক গিয়েছ কি —এটা মনে রেখো!' বলে মা দূর থেকেই চড় দেখালেন আমায়। আমি হাসতে হাসতে মাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'না মা, আমি কোথাও যাব না। ওখানেই বসে বসে পড়া মুখস্ত করব।'

আলুবোখারা গাছের তলায় ভালো ছেলের মতো বসে বসে পড়ব, সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বাগানে আলুচা-র অনেক গাছই রয়েছে। চেরী অর্থাৎ জাপানী আলুচা-রও গাছ আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে মিষ্টি যে-আলুচা, পাকলে অন্যান্য আলুচা-র চেয়ে লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে, লোকে সাধারণত তাকে আলুবোখারা বলে। আর সেই আলুবোখারার গাছ বাগানে ওই একটাই। বাজারে আলুবোখারা ওঠে সমস্ত আলুচা-র পরে। কিন্তু এখন তো আলুবোখারার সময় নয়, এখন গাছের পাতা ঝরার সময়। চিনারের পাতা লাল হয়ে এসেছে একেবারে। তবু আলুবোখারা গাছের তলায় বসে পড়া করতে চাই আমি, তার কারণ অবশ্য আলাদা।

বাপী আমায় যে ইংরেজি ছবিওয়ালা বইখানা এনে দিয়েছেন, তাতে একটা খুব চমৎকার ছবি আছে। এক বিলিতী পাখির বাসার ছবি। সেই বাসায় গোটা তিনেক ভারি সুন্দর ঝকঝকে ডিম রয়েছে। ফুটফুটে সাদা, গায়ে নীল ছোপ-ছোপ দাগ। ঠিক ওই রকম নীল ছোপওয়ালা ডিমের বাসা আমি আলুবোখারার ঘন ডালপালার মধ্যে দেখেছি। প্রথমে তো ডিমগুলো দেখেই আনন্দে-উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপতে লেগেছিল। তারপর একটা ডিম তুলে হাতের চেটোয় রেখেছিলাম। আহা, কি চমৎকার! ইচ্ছে করছিল, ওটা পকেটে রেখে দিই। কিন্তু হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ল। একবার বুলবুলি পাখির ডিম চুরি করার জন্যে মা আমায় ভীষণ বকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'ফের যদি তুমি কখনো ডিম চুরি করো, তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়ব কিন্তু। পাখি কেঁদে কেঁদে পরমাত্মার কাছে নালিশ জানাবে, আর পরমাত্মা পাখির ডিম চুরি করার জন্যে কঠিন সাজা দেবেন। আমার তো মনে হয়, হবে হাঁটতে হাঁটতে তুমি বাড়ির রাস্তাটাই ভুলে যাবে, কিংবা কোনো জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাবে, সেখান থেকে আর বাড়ি ফিরতেই পারবে না। আর তারপর, একটা শকুনি এসে তোমায় ডানায় তুলে নিয়ে কোথায় কোন দূরে এক অজানা দেশে নিয়ে চলে যাবে।'

আমায় ভয় দেখানোর জন্যে মা এমনি এক লম্বা-চওড়া গল্প ফেঁদে ছিলেন। সেই গল্প আমার মনে এমন দাগ কেটে বসে গিয়েছে যে, সেই দিন থেকে পাখির বাসা

থেকে ডিম চুরি করার চিন্তাটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। শুধু কখনো-সখনো, নিতান্তই শখের জন্যে বাধ্য হয়ে ডিমওয়ালা পাখির বাসার কাছে গিয়ে হাজির হই। ডালপালা সরিয়ে ডিমগুলো চেয়ে চেয়ে দেখি, কি চমৎকার! জীবনে অমন সুন্দর ডিম আজ পর্যন্ত দেখিনি, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সাদা, ওপরে চাকা-চাকা নীল দাগ! —ব্যস্, ডিমটা তুলে পকেটে পুরে ফেলছি আর কি, অমনি মা-র সেই ভয়ংকর গল্পটা মনে পড়ে যায়।

আজও গাছটার দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সে দিকে। তারা আগে থেকেই আমার জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ছোট্ট কাঁসার বাটি।

আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি আছেরে ওতে?'

সে বলল, 'তোমার জন্যে মিঠে পোলাও এনেছি।'

'তোদের বাড়িতে আজ মিঠে পোলাও হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? আজ কোনো পরব না-কি?'

'না। আজ বহুৎমতুর মা চাল আর চিনি দিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। মাকে বললে—আজ আমাদের বাহাদুর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে, বাড়িতে তোমরা পোলাও তৈরি করে খাও।'

'বাহাদুর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে? কেন?'

'আমি কি জানি? তুমিই তো জানবে মশাই, ডাক্তারের ছেলে তুমি—আমি তো আর নই!'

'আমি তো কিছু জানিনে!' বিষণ্ণ গলায় বললাম, 'কেউ কিছু বলেনি আমায়। ওরা আমায় কখনও কিছু বলেই না!'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনছি। ও কাল রাতেই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে কোথায় চলে গেছে। তাই আজ বাড়িতে বাড়িতে মিঠে পোলাও রান্না হয়েছে।'

'পালিয়েছে, বেশ করেছে। তা মিঠে পোলাও রান্না হবে কেন?'

'সত্যি মিঠে পোলাও রান্না হয়েছে। আর যাতে সে অনেক দিন বেঁচে-বর্তে থাকে, আল্লার কাছে দোয়া করছে সবাই। নাও, পোলাও খাও...'

'তুইও খা।'

'আমি খেয়ে এসেছি। শুধু এই একটুখানি মা-র চোখ এড়িয়ে কোনো রকমে এনেছি।'

আমি পোলাও খেতে শুরু করলাম। সত্যিই খুব মিষ্টি। খুব চমৎকার বাসমতী চালের খোশবু। প্রত্যেকটি দানা সোনার মতো হলুদ। আমায় খেতে দেখে তারার জিভেও জল এল। সে-ও খেতে শুরু করে দিলো আমার সঙ্গে। খুব তাড়াতাড়িই আমরা দু'জনে মিলে বাটিটা চেটে-পুটে সাফ করে ফেললাম।

তারা মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'চলো, এ বার গাছে উঠে সেই সুন্দর ডিমগুলো দেখে আসি।'

অতএব আমরা দু'জনেই গাছে চড়ে বাঁদরের মতো একটা ডাল ধরে এগিয়ে চললাম। ডালটা গিয়ে আরেকটা ডালের সঙ্গে মিশেছে, ঠিক যেন পরস্পর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। সেখানে আরও ছোট ছোট ডালপালা রয়েছে। ঘন পাতার ঝোপ। ডালপালা সরিয়ে বাসাটার মধ্যে উঁকি দিলাম।

'আঃ, কি সুন্দর!' তারা খুশিতে চিৎকার করে উঠল। নিজের অজান্তেই ডিমগুলোর দিকে সে হাত বাড়াল।

আমি বললাম, 'এই হাত দিসনে।'

'শুধু একটা ডিম নেব। মোটে একটা —পাখি কি আর বুঝতে পারবে?'

আমি ওকে বোঝালাম, 'না। এগুলো বিলিতী পাখির ডিম। ওরা সব জানতে পারে। ঠিক বুঝে ফেলবে, আমরা ওর ডিম চুরি করেছি। তারপর পরমাত্মা আমাদের বাড়ির রাস্তা ভুলিয়ে দিয়ে একটা ঘন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। আর তখনই একটা খুব বড় শকুনি এসে আমাদের তুলে নিয়ে কোনো এক অজানা দূর দেশে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে দেবে।'

'হায় রাম!' বলে তারা প্রায় চিৎকার করে উঠল। ইত্যবসরে সে হাতে একটা ডিম তুলে নিয়েছিল। গল্পের পরিণতি শুনে ভয় পেয়ে ডিমটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো। আমি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে সেটা ডালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে একেবারে ফেটে চৌচির।

কয়েক মুহূর্ত আমরা একেবারে বোবা। হতবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কি হবে এখন? কি হবে? অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আমরা গাছ থেকে নেমে পড়ি।

ডিমের খোলাটা তুলে নিয়ে দেখি, সেটা ভেঙে-চুরে একশা হয়ে গেছে। খোলাটা থেকে সাদা ও হলুদ রঙের পদার্থ টপ্‌টপ করে মাটিতে ঝরে পড়ছে।

তারা ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। আতঙ্কে তার চোখ দুটো ছলছল করছে। আমার হাত ধরে ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি হবে এখন?'

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'কি আর হবে? এখন মাকে গিয়ে বলতে হবে সব কথা। মা মুন্সিজীকে ডেকে আনবেন। মুন্সিজী মন্ত্র পড়ে আমায় সপ্তশস্য দিয়ে ওজন করাবেন। তারপর মা আমায় নিয়ে যাবেন মন্দিরে, গুরুদ্বারে। তারপর পীর সাহেবের মাজারে, সেখানে আমার বন্ধু অব্বাস সঙ্গে দেখা হবে।'

'আর আমি কি করব? আমরা তো খুব গরিব! মা আমায় সপ্তশস্য দিয়ে ওজন করাতে পারবে না। মারবে আমায়।' তারার কণ্ঠস্বরে একরাশ ভয়।

'না, মারবে না। তুই এক কাজ কর, তোর মাকে এখন কিছু বলবিনে। আমার দোস্ত অব্বাকে আমি বলব। সে তোর নামেও পীর সাহেবের মাজারে

একটা পুঁটুলি বেঁধে দেবে মা-বুবু। আর তাতেই তোর আমার দু'জনেরই পাপ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো।' তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আবার হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে। হাসতে হাসতে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'চলো, এখান থেকে যাই। ওই চিনারের জঙ্গলে গিয়ে আমরা খেলব। চিনারের লাল লাল পাতা দিয়ে নৌকো তৈরি করে নদীর জলে ভাসাব।'

আমরা দু'জনে এক মনে নৌকো তৈরি করছি, এমন সময় আমাদের বাড়ির চাকর হাবিব দৌড়তে দৌড়তে আমার কাছে এল। আমায় বলল, 'চলো, মা তোমায় ডাকছে।'

আমি তারাকে বললাম, 'তুই এখানে বসে বসে নৌকো তৈরি কর। আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে আসছি।'

তারা বলল, 'শিগগির এস কিন্তু।'

'এক্ষুনি ফিরে আসব।'

আমি হাবিবের আগে আগে নাচতে নাচতে —বলতে কি, দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির দিকে চললাম।

বাংলোর বারান্দায় বাপী দাঁড়িয়ে। মা-ও রয়েছেন সেখানে। দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন তাঁরা। বাড়ির সমস্ত ঝি-চাকর এক-পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই চোখে জল। মা কাঁদছেন, ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন মাঝে মাঝে। বাপী অস্থির অধৈর্য অবস্থায় বারান্দায় পায়চারি করছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলাম, বাহাদুর যে পালিয়ে গেছে, সে জন্যে মা-কি বাপীই দায়ী। সমস্ত দোষ বাপীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন রাজাসাহেব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।

তিন জন কম্পাউণ্ডার হাত জোড় করে মাধবীলতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বিবর্ণ চেহারা, ঠোঁট দুটো যেন পরস্পর চেপে বসে আছে। ওদের কাছাকাছি রাজ-দরবারের পেয়াদা দাঁড়িয়ে, হাতে রাজাসাহেবের হুকুমনামা। পেয়াদার কাছে দাঁড়িয়ে খাজা আলাউদ্দিন চোখ নীচু করে বাপীকে বলছেন, 'রাজাসাহেব ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। তিনি তো আপনার মাথা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিষেধ করি। তিনি সেটা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু আবার বললেন, আপনার মুখে চুনকালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা বাজারটা ঘোরাবেন, তারপর জেলে বন্দী করে রাখবেন। আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করলে শেষ পর্যন্ত তিনি শান্ত হন। কিন্তু বলে দিয়েছেন —চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে বাংলো খালি করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু আপনি তো জানেন, খাস দরবারে তাঁর কথা বলার লোক আমি একা। সকলের জন্যেই

লড়াই করতে হয় আমার। অন্যরা শুধু খোশামুদে গলায় রাজাসাহেবের কথায় সায় দিতে জানে।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি।' বাপী মৃদু অথচ তলোয়ারের মতো ধারাল গলায় বললেন। তারপর মা-র দিকে ফিরে বললেন, 'জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে ফেলো।'

মা কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে গেলেন। ভেতরে গিয়ে ঝি-চাকরদের ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

খাজা আলাউদ্দিন বললেন, 'রাজাসাহেব হুকুম দিয়েছেন, আজ থেকে এই সব চাকর-বাকরও আপনার নয়। আপনি যদি ওদের কাউকে দিয়ে কাজ করান, তাহলে সে বেচারাও চাকরি থেকে ডিসমিস হয়ে যাবে।'

মা ভেতর থেকে ডাকছেন, 'হামিদ, বেগম, অমৃত সিং, রত্না…'

সবাই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না কেউ।

বাপী ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে খাজা আলাউদ্দিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো ক্ষতি নেই। নিজেদের জিনিসপত্র আমরা নিজেরাই বেঁধে-ছেঁদে নিচ্ছি। আপনি শুধু এইটুকু করুন, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে কয়েক জন মজুর, আর আমার স্ত্রী ও ছেলের জন্যে একটা পাল্কির ব্যবস্থা করে দিন।'

খাজা আলাউদ্দিন মাথা হেঁট করে কপালে হাত ছুঁইয়ে বাপীকে আদাব জানিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাসানুদাস ডাক্তারবাবু। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন দু'বার। আমার গায়ের চামড়ায় জুতো তৈরি করে পরতে পারেন আপনি। কিন্তু কি করব বলুন, সরকারের হুকুমের গোলাম আমি! নইলে এমন কুসংবাদ নিয়ে হাজির হতে হয় আমায়! কিন্তু রাজাসাহেবের হুকুম, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। আপনি কিছু ভাববেন না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি মজুর-পাল্কি-কাহার সব পাঠিয়ে দিচ্ছি, তবে ওদের সব খরচপত্র আপনার।'

খাজা আলাউদ্দিন পেয়াদাকে চোখের ইশারা করলেন, তারপর দু'জনেই চলে গেলেন সেখান থেকে। মা একা সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করতে লাগলেন। বাপী ভেতরে গিয়ে বললেন, 'সব জিনিসপত্র নেওয়ার দরকার নেই। কেবল দরকারী আর দামী জিনিসগুলো নিয়ে নাও। দেশের বর্ডার এখান থেকে পনেরো মাইল। চব্বিশ ঘণ্টার আগেই আমাদের বর্ডার পেরিয়ে যেতে হবে।'

মা কোনো জবাব দিলেন না। নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার কথাটা মনে পড়ল, চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম আমি।

'কি হয়েছে মুন্না?' বাপী সংযত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি নিজের দোষ স্বীকার করে বললাম, 'এ সব আমারই দোষ। আমি বিলিতী পাখির ডিম ভেঙে ফেলেছি, তাই বাড়িতে বিপদ হয়েছে। কিন্তু আমি

ডিম চুরি করার জন্ত গাছে চড়িনি বাপী। আমি আর অন্যরা ডিম দেখতে গিয়েছিলাম। একটা ডিম হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।'

আমি কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনাটা বলছিলাম। মা জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করতে করতে সটান উঠে দাঁড়ালেন। আমায় কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন, 'মা সোনা, এতে তোমার কিছু দোষ নেই। কোনো দোষ নেই তোমার, এ সব আমাদের ভাগ্যের দোষ, কর্মের ফল।'

হঠাৎ বাপী যেন গর্জে উঠলেন, 'তাহলে কি ওকে প্রাণে মেরে ফেলা উচিত ছিল? কর্মের ফল, ...কর্মের ফল? তোমার যদি অমন ধর্মকর্মওয়ালা লোকই দরকার ছিল, তাহলে একজন ডাক্তারকে বিয়ে করেছিলে কেন? রাজা ইশারা করলেই যে রাজার বিরোধীদের মুণ্ডু কলম করে দেয়, সে রকম একজন জল্লাদকে বিয়ে করলেই হতো।'

মা ভীত কণ্ঠে বললেন, 'আমি এ কথা তোমায় কখন বললাম! ছেলে ভয় পেয়েছে আমি তো ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।' বলেই মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা দু'জনেই কাঁদতে শুরু করলাম।

বাপী রাগে পা ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মা অনেকক্ষণ হলো দরকারী জিনিসগুলো বেঁধে ফেলেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো মজুর এল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক প্রতীক্ষা করার পর খাজা আলাউদ্দিনের কাছ থেকে একজন লোক এল। সে খবর দিলো, কোথাও মজুর পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো পাল্‌কিও খালি নেই।

খবরটা দিয়েই লোকটা তক্ষুনি এমন করে ছুটে পালাল যেন শিকারী কুকুরে তাড়া করেছে তাকে। সে চলে যেতেই বাড়ির সব লোকজন উধাও হয়ে গেলো। চাকর নেই, মালী নেই, কম্পাউণ্ডার নেই। কোথাও কোনো প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাংলোটা যেন খাঁ-খাঁ করছে।

বাপী মাকে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'কাকার মা, সব জিনিসপত্র এখানেই থাক। খালি হাতেই যেতে হবে আমাদের।'

কথাটা বলেই বাপী আমায় কোলে তুলে নিয়ে মা-র দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের সেই নীরব দৃষ্টিতে তিনি যেন মাকে ওই অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বলছিলেন।

পুরুষের তো অনেক কিছুই থাকে —তার বন্ধু-বান্ধব থাকে, কাজ-কর্ম থাকে; এক বিশাল বিস্তৃত জগৎ থাকে। কিন্তু নারীর সকল বলতে শুধু একখানি বাড়ি। মা অসহায় দুঃখ-ভরা চোখ তুলে বাপীর দিকে তাকালেন। অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি একবার রাজাসাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত ছোঁয়াও, তাহলে হয়তো তিনি ক্ষমা করবেন।'

বাপী গর্জন করে উঠলেন, 'বেরিয়ে এস।'

মা অসহায় করুণ চোখে তাঁর সাজানো-গোছানো সংসারটার দিকে একবার তাকালেন। রাতদিন খেটে প্রতি মুহূর্তে তিনি বাড়িখানা সাজিয়েছেন। বাড়ির মধ্যে ওই ঠাকুরঘর, চমৎকার রান্নাঘর আর ওই ঘরখানায় আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। এ ঘরখানায় সোফা-খাট-আলমারি-আয়না-পর্দা-টেবিল ল্যাম্প। এ বাড়ির প্রত্যেকটি ইটে নারীর মমতা-ভালোবাসা-স্নেহযত্ন আর তার পারিবারিক জীবন যাপনের মধুর গন্ধ ছড়ানো। একটি নারী কি করে সেই বাড়ি ছেড়ে সহজে চলে যেতে পারে!

প্রাণের মতো প্রিয় কাউকে চিরদিনের মতো বিদায় জানাতে গিয়ে মানুষ যেমন তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে আকুলি-বিকুলি করে, ঠিক তেমনি মা বাড়ির এক একটি আসবাবপত্রের কাছে গিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরছেন আর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

বাপীর চোখ দুটোও অশ্রুভারাক্রান্ত। কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না তিনি। আমায় কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দা থেকে বাগানে, বাগানের পথ ধরে বাংলোর গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তাটা নদীর দিকে গেছে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন বাপী। হঠাৎ দেখি, মা সব ছেড়ে-ছুড়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে পাগলের মতো আমাদের পেছনে পেছনে ছুটে আসছেন। তাঁর পরনের শাড়ি রাস্তায় ধুলোয় লুটোচ্ছে। হাতে একটা ছোট বাক্স। আছাড় খেতে খেতে নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিচ্ছেন যেন। বাপী একটু থেমে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলেন। মা কাঁদছেন আর আমাদের পেছনে পেছনে ছুটছেন।

জনশূন্য পথ। এ সময় কত লোকজনকে পথ চলতে দেখা যায়। কিন্তু আজ সেই পথে কেউ নেই। একটা বাদাম গাছের তলায় এক গোয়ালা গরু-মোষ চরাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই সে তৎক্ষণাৎ ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে নীচের রাস্তায় গিয়ে আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন এক খচ্চরওয়ালার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। লাঠি হাতে তিনটি খচ্চর হাঁকিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চলেছে। বাপী তাকে ডেকে বললেন, 'ও খচ্চরওয়ালা, আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?'

'কেন দেবো না হুজুর!' কোনো কিছু খেয়াল না করেই সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। কিন্তু যখন সে বাপীর দিকে ভালো করে তাকাল, মুহূর্তে তার বীরত্ব উবে গেলো একেবারে। ভীতকণ্ঠে বলল, 'না হুজুর, না। আমি —মানে আমার খচ্চর খালি নেই হুজুর। আমি নদীর ওপারে যাচ্ছিনে, এই এ পারেই থাকব।' বলেই সে লাফ দিয়ে একটা খচ্চরের পিঠে উঠে বসল। তারপর তার তিনটি খচ্চরকে ছুটিয়ে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল সেখান থেকে।

নদীর ধারে ধারে ধানক্ষেত। ধানক্ষেত থেকে দূরে একটা উঁচু জায়গায় চাষীদের কিছু ঘরবাড়ি। একসঙ্গে সেগুলো একটা ঝোপের মতো দেখাচ্ছে।

বাড়িগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাতেই লক্ষ করলাম, চাষীরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে রেখেছে। রাস্তায় কিংবা গলিতে লোকজন নেই। শুধু কয়েক জন চাষী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হচ্ছে না যেন।

বাপী, মা আর আমি হাঁটছি। ওদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক জন চাষী এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে বাপীর পা স্পর্শ করল তারা। মুখে কিছু বলল না। বলল না, তার কারণ, এখনো তাদের বলার সময় আসেনি। এই মুহূর্তে কিছু বলাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন শুধু অশ্রু ঝরাতে পারে তারা।

নদীতে পৌঁছে বাপী আমায় কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর মা-র হাত ধরে নদী পার হতে লাগলেন। হেমন্ত কাল, তাই নদীতে জলের গভীরতা কম। কিন্তু জায়গায় জায়গায় বেশ স্রোত রয়েছে। জলের তলায় নীল রঙের পিছল পাথর ছড়িয়ে আছে। দু' বার সেই পাথরে পা পিছলে মা নদীতে পড়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় ভিজে একশা হয়ে গেছে।

নদীর পাড়ে উঠে মা একটা গাছের আড়ালে গিয়ে তাঁর ভেজা কাপড় নিঙড়ে নিলেন। তারপর আবার আমরা দ্রুত পা চালিয়ে কুদরত শাহ্ টিলার ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম। কখনো আমি হাঁটছি; কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাপী আমায় কোলে তুলে নিচ্ছেন। বাপীর হাত ধরে গেলে মা নিচ্ছেন আমায়। আর দু'জনেই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, তখন আমি আবার হাঁটতে শুরু করছি।

যখন আমরা কুদরত শাহ্ টিলার ওপরে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে চলেছেন। টিলার ওপর থেকে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, আমাদের ফেলে আসা সারা অঞ্চলটা চোখের সামনে। ওই চমৎকার ধানক্ষেত, ধানক্ষেতগুলোর মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া আঁকা-বাঁকা স্বচ্ছ নদী, নদীর পারে ঢালের নীচে সবুজ গাছপালায় ঘেরা আমাদের বাংলো। বাগানের পশ্চিম কোণে চারটি চিনার গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাছগুলোর তলায় বসে বসে নৌকো তৈরি করছে তারা, ওকে ওখানে রেখেই চলে এসেছি আমি। অগ্নিশিখার মতো দীপ্ত চিনারের তলায় বসে বসে তারা আমার প্রতীক্ষা করছে।

আমি সে দিকে দু' হাত বাড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম, 'মা, আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। আমি বাড়ি যাব মা।'

মা চোখের জল চেপে বাপীর দিকে তাকালেন। বাপী তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন, সে দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সমস্ত অঞ্চলটাকে বুকের মধ্যে ভরে নিচ্ছেন তিনি। তারপর হঠাৎ মা-র দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কথার সময় নেই। অনেক দিন ফুরিয়ে গেলো। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই আমাদের বর্ডার পেরিয়ে যাওয়া দরকার। এখনো দশ মাইল পথ বাকি।'

বাপী সামনের রাস্তার দিকে তাকালেন। রাস্তাটা পীর পাঞ্জাল পাহাড়ের চূড়োর দিকে গেছে। পীর পাঞ্জালই হচ্ছে রাজাসাহেবের রাজ্যের সীমান্ত। কিন্তু

সামনে সোজা চড়াই। এবড়ো-খেবড়ো উপলাকীর্ণ বন্ধুর পথ। কোথাও একটু গাছপালার ছায়াও নেই। চারদিক রোদ্দুরে খাঁ-খাঁ করছে।

'ওঠো ওঠো, এখন আরাম করার সময় নেই।' বাপী আবার বেশ শক্ত গলায় বললেন।

মা উঠে দাঁড়ালেন। শেষবারের মতো এমন ক্ষুধাতুর চোখে আমাদের বাংলোর দিকে তাকালেন, যেন সমস্ত এলাকাটা নিজের বুকের ভেতরে তুলে নেবেন। তারপর ফিরে বাপীর দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'কিন্তু আমরা যাব কোথায়? ও দেশে তুমি রেসিডেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এলে। ও রাজ্যের রাজার সঙ্গে ঝগড়া করলে। ইংরেজদের সঙ্গেও তোমার বনিবনা হলো না। এখানেও রাজাসাহেবের সঙ্গে তুমি ঝগড়া বাধালে। এখন আমরা কোথায় যাব? কে আশ্রয় দেবে আমাদের?'

বাপী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'যেতে হয়, চলো। নইলে তুমিও রাজাসাহেবের মহলে থাকো গিয়ে। মেয়েদের প্রয়োজন তাঁর সব সময়েই।'

বলেই বাপী একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা পীর পাঞ্জাল পাহাড়ের রাস্তার দিকে এগিয়ে চললেন।

মা ঘা-খাওয়া সাপের মতো উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের অঞ্চলটার দিকে জোরে থুতু ছিটিয়ে দিলেন। তারপর আর কিছু না বলে-কয়েই আমার হাত ধরে হেঁচড়ে টানতে টানতে বাপীর পেছনে পেছনে ছুটলেন।

বাপী আগে আগে হাঁটছেন। মা পাথরে হোঁচট খেতে খেতে টলতে টলতে পেছনে পেছনে চলেছেন। আর আমি মা-র পেছনে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটছি। কাঁদছি আর বলছি, 'মা আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। বাপী, আমায় বাড়ি নিয়ে চলো।' কেন না, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। আমার জানা ছিল না, যিনি সত্যের পথে চলেন, তাঁর কোথাও ঘরবাড়ি থাকে না। কোথাও গেলে তিনি আশ্রয় পান না। তাঁর চলার পথে কোনো ছায়াঘন বৃক্ষ থাকে না। তিনি কিন্তু মনের মধ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাঁর নিজের পথে এগিয়ে চলেন। পেছনে চিনারের প্রান্তর ফেলে রেখে যান। ধরিত্রীর বুক থেকে উদগত আগুনের শিখার মতো সেই চিনারের বৃক্ষগুলি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে তাঁর আত্মোৎসর্গের সাক্ষ্য ঘোষণা করে।